NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG EDUCATION

PAPER 8 (Beng.)
MODULES 1 & 2 [E-4]

POST GRADUATE
EDUCATION

প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : শিক্ষা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম পর্যায় : PG Education 8 (E4) 1 : 2

রচনা

অধ্যাপক প্রণব কুমার চক্রবর্তী

সম্পাদনা

অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education – 8 (E4)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক 1	জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা	7–21
একক 2	জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি	22–34
একক 3	জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান	35–49
একক 4	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ	50–59
একক 5	জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা ও পাঠক্রম	60–72

পর্যায় 2

একক 6	পরিবেশ শিক্ষার ধারণা	75--92
একক 7	পরিবেশের জন্য উদ্বেগ	93--114
একক 8	পরিবেশ শিক্ষার সংস্থাসমূহ	115–129
একক 9	পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এবং ধারা	130–147
একক 10	পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ	148--163

একক ১ ☐ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা (Concept of Population Education)

গঠন (Structure)

১.১ সূচনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারাণা

১.৩.১ জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা

১.৩.২ জীবনযাত্রার মান

১.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি

১.৪.১ সম্পর্ক ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

১.৪.২ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি

১.৪.৩ জনসংখ্যার ও পরিবেশের সম্পর্ক

১.৪.৪ পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু

১.৪.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণ

১.৪.৬ মূল্যায়ন

১.৪.৭ জনসংখ্যা শিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যা

১.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য

১.৬ জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১.৭ ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম

১.৮ সারসংক্ষেপ

১.৯ অনুশীলনী

১.১ সূচনা (Introduction)

১৭৯৮ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ টমাস রবার্ট ম্যালথস (Thomas Robert Malthus) জনসংখ্যা ও তার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন জনসংখ্যা সম্বন্ধে সম্ভবত সেইটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। তাঁর মতে সময়মত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, যুদ্ধ, মহামারী, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা স্বাভাবিক কারণে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করবে। ম্যালথস যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন পরবর্তীকালে তা বহু সমালোচিত হলেও একটি বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায়নি। সেটি হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপরোক্ত সমস্যাগুলির অনিবার্য সম্পর্ক।

বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশ্বে নতুন করে সচেতনতা দেখা গেল। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এমনি নানা বিষয়কে শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মানতে চাইলেন না। বরং তাঁদের মতে ঐগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই জন্য ১৯৭০-এর দশকে জনসংখ্যা ও তার কারণ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন থেকেই জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education) নামক বিদ্যার উৎপত্তি। শিক্ষাবিজ্ঞানে জনসংখ্যা শিক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্থান পাওয়ার পর থেকে পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষাও বিশেষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রথম পাঠে বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পরিচিতি ঘটানো হবে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি ও অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

১.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা (Concept of Population Education)

১৯৭০-এর দশকে যখন জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হল তখনও এই নতুন বিষয়টির স্বরূপ, সংজ্ঞা ও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। শুধু একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি একটি নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে ইতিবাচক চিন্তাধারায় উত্তরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

নেতিবাচক চিন্তাধারাটি বহুদিন ধরেই প্রচার করা হচ্ছিল কিন্তু তাকে সংগঠিত তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করে ক্লাব অব রোম (Club of Rome) নামক একটি গোষ্ঠী। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে তারা নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বিশ্বের দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিতে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্ত রকম পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং যে কোন মূল্যে, ছলে বলে কৌশলে এই সব দেশগুলিতে (প্রধানত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্থাৎ দরিদ্র দেশগুলির জনসংখ্যা সভ্যতার পক্ষে আপদ বিশেষ।

সুখের বিষয় অধিকাংশ জনসংখ্যাবিদ্, পরিবেশবিদ্ ও অর্থনীতি বিশারদরা এই মত মানেননি। সমস্ত রকম তাত্ত্বিক বিচার ও বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে দেখা যায় ধনী দেশের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ

মাত্র হলেও তারা মোট সম্পদের ৭৫ ভাগ তারাই ভোগ করে। বাকি ৭৫ শতাংশ মানুষের জন্য থাকে ২৫ শতাংশ সম্পদ মাত্র। দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন অতি সামান্য অথচ তারা দূষণহীন যে কায়িক শ্রম উৎপাদনের কাজে ব্যয় করে তার সম্পদমূল্য অসীম। সুতরাং জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসাবে দেখতে হবে। এই সম্পদের উন্নয়ন অর্থাৎ, অনগ্রসর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমেই পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভব হবে তেমনি জনসংখ্যাও স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ শুধু মাত্র বিধিনিষেধ, আইন প্রণয়ন, নির্যাতন ইত্যাদির সাহায্যে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই একমাত্র পন্থা।

জনসংখ্যা শিক্ষার মূল কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যেসমস্ত সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলি সম্পৃক্ত সেগুলি ভালো করে বুঝে নিয়ে তার সাহায্যে একধরনের মানসিক প্রতিন্যাস (Attitude) ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করা যা ব্যক্তির নিজস্ব জীবন, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে। এই সংক্রান্ত যা কিছু জ্ঞান তা সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আর কোন স্বতন্ত্র প্রয়াস দরকার হবে না।

এই ইতিবাচক ধারণার ভিত্তিতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা স্থির করা দরকার।

১.৩.১ জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার সহজতম সংজ্ঞা হল, জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি, ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার (Assembly of all Knowledges concerning, the nature of population. population growth and its control)।

এই সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কারণ, এখানে কতগুলি প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের সমাহারকে বলা হয়েছে জনসংখ্যা শিক্ষা, যার উপাদান ও উদ্দেশ্য খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেজন্য ভিন্নতর ভাবে বলা যায়, যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, একদিকে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা তার নিজের, চারপাশের পরিবেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন করার ভিত্তিতে জীবনের মান সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবে তাকেই বলে জনসংখ্যা শিক্ষা (The educational programme through which the learners will be able to develop a specific value system about the quality of life based on the understanding of the relation between himself, the environment around and the various forces of the world on the one hand and the nature and significance of population on the other, is called Population Education)

তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সংখ্যাটি জনসংখ্যার শিক্ষার সমস্ত প্রসঙ্গগুলিকে স্পর্শ করেছে। যেমন,

- জনসংখ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবনের মান সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ও বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তোলা।
- এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য অনেকগুলি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা দরকার।
- পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে আছে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করা।
- অন্যদিকে আছে ব্যক্তির সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির (যেমন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ইত্যাদি) সম্পর্ক।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী জনসংখ্যা শিক্ষা একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যার উপাদান ব্যাপক ও বিস্তৃত।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি ও পাঠক্রম তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (The National Council of Educational Research and Training) প্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁরা প্রথম যে পাঠক্রমের খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের আকৃতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, জনসংখ্যা সীমিত রাখলে দেশে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখায় সহায়ক হবে, এবং পরিবারের আকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি একক পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়াও তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি রক্ষা করার জন্য এবং তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের আকৃতি ছোট রাখা দরকার (The objective of population education should be to enable the students to understand that the family size is controllable, that population limitation can facilitate the development of higher quality of life in the nation and that a small family size can contribute materially to the quality of living for the individual family. It should also enable the students to appreciate the fact that, for preserving health and welfare of the members of the family, to ansure the economic stability of the family and to assure good prospects for the younger generation, the Indian families today and tomorrow should be compact and small)

NCERT প্রণীত খসড়াতে আরও বলা হয় সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই অধিকার থাকবে যে তারা পরিবারের আকৃতি পরিবর্তনের ও জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে কি কি পরিবর্তন হল এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের মঙ্গল সাধন করার উপর সহায়ক প্রভাব ফেলা যাবে (Students at all levels have a right to acquire information about the effect of changes in family size and in national population on the individual, the family and the nation, so that this body of knowledge is utilised to control family size and national population with benefecial impact on the economic development of the nation and the welfare of the individual families)

NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলিও তার অন্তর্গত উদ্দেশ্য কিছুটা সংকীর্ণ কেননা তা পরিবার পরিকল্পনা (Family planning) নামক কার্যক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

UNESCO (1971) জনসংখ্যা শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"Population Education is our educational programme which provides for a study of the population situation in the family, country, nation and world with the purpose of development in the students of rational and responsible attitude and behaviour towards that situation"

অপরদিকে R. C. Sharma (1983) মনে করেন,

"Population education is an educational programme which helps learners to understand the interrelationship of population dynamics and other factors of quality of life and to

make informed and rational decisions with regard to population related behaviours with the purpose of improving quality of life of himself, his family, community, nation and the world."

বলা বাহুল্য UNESCO প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সরল মনে হলেও পূর্ণাঙ্গ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

১.৩.২ জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)

জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞায় জীবনযাত্রার মান কথাটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তা বলা হয়নি। জীবনযাত্রার মান আপাতদৃষ্টিতে একটি আপেক্ষিক কথা, দেশ ও কালভেদে তার পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনযাত্রার জন্য মৌলিক চাহিদাগুলির ভিত্তিতে এবং ঐ সব মৌলিক চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে জীবনযাত্রার মান একটি জটিল ধারণা। বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনযাত্রার মান পাঁচটি প্রধান উপাদানের একটি জটিল সমন্বয়।

● **সম্পদ (Resource)** : সহজ কথায় যে বস্তু বা প্রকৃতির অংশ মানুষের হিতার্থে ব্যবহারের উপযোগী তাকেই বলা যায় সম্পদ। যা ব্যবহারোপযোগী নয় তা সম্পদ নয়। সমুদ্রের বায়ু প্রবল শক্তিধর, কিন্তু তা কোন সম্পদ নয়। কিন্তু যদি সেই সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় তবে তা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। মাথা পিছু সম্পদের ব্যবহার জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করার অন্যতম সূচক। বিশেষজ্ঞরা পাঁচ প্রকার সম্পদকে চিহ্নিত করেছেন। যথা—

(১) মানব সম্পদ (Human Resource) : যে মানুষ কোনও না কোনভাবে কর্মক্ষম তার শ্রম, মেধা, বিদ্যা ইত্যাদি সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

(২) খাদ্য (Food) : খাদ্য সম্পদ আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, জীবন ধারণ, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য প্রয়োজন।

(৩) ধন (Capital) : ধন সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না কিন্তু চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করায় ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি ধন সম্পদ।

(৪) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) : প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত যাবতীয় বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি যা কিছু আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং ধনসম্পদ যোগায় সবকিছুর একত্রিত নাম প্রাকৃতিক সম্পদ।

(৫) প্রযুক্তি সম্পদ (Technological) : প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টি করা সম্পদ। প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রূপান্তর ও অনুসন্ধান সম্ভব হয়। যে মানুষের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার জীবনে প্রযুক্তির ভূমিকা ততই গুরুত্বপূর্ণ।

● **জীবনযাপনের স্তর (Level of living) :** যথেচ্ছ সম্পদের প্রাচুর্য জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে না। প্রচুর খাদ্য সম্পদ ও যথেচ্ছ অপরিমিত আহার উন্নত জীবনযাপনের নির্দেশক নয়। এই ক্ষেত্রে যে পাঁচটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

(১) জাতীয় মোট উৎপাদনের মাথাপিছু হার (Per capita (GNP) : যে দেশের অর্থনীতি যত সবল সে দেশের জাতীয় মোট উৎপাদনের পরিমাণ বেশি এবং মাথাপিছু বন্টনের হার তত বেশি। জনসংখ্যা সীমিত থাকলে

মাথাপিছু বণ্টন বেশি হবে। বিপরীতক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখতে উদ্যোগী হয়।

(২) স্বাস্থ্য (Health) : জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ে, স্বাস্থ্য পরিসেবাও উন্নত হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল।

(৩) বাসস্থান (Housing) : যে দেশের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার বাসস্থান ও বাসগৃহ ততই উন্নত হয়। বলাবাহুল্য উন্নত বাসস্থান ও বাসগৃহ, নগরায়ন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

(৪) সামাজিক মঙ্গল (Social Welfare) : উন্নত সমাজ উন্নত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। সামাজিক হিতসাধন কথাটির অর্থ কুসংস্কার মুক্ত, ভেদাভেদহীন, সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্তব্যবোধের সুষ্ঠু সমন্বয়।

(৫) শিক্ষা (Education) : শিক্ষার আনুভূমিক বিস্তার (Horigontal Spread) ও উল্লম্ব বৃদ্ধি (Vertical growth) এই দুই-ই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত। সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার, গুণগত ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দান ও সুযোগ গ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অন্যতম সূচক হিসাবে সর্বত্র গৃহীত।

● **জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics) :** জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এর অন্তর্গত উপাদানগুলি পাঁচটি।

(১) জনসংখ্যা (Population) : জনগণনার সাহায্যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেশের মোট জনসংখ্যা স্থির করা হয়। জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান পরস্পর ব্যস্ত সমানুপাতিক (Invirsely proportional)।

(২) বৃদ্ধির হার (Growth rate) : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক। আমাদের দেশে বৃদ্ধির হার বেশি, চিনে কম। সেজন্য চিনের উন্নয়ন অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে।

(৩) বয়স অনুযায়ী গঠন (Age Structure) : কোন বয়সের মানুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কত তাকে বলে বয়স অনুযায়ী গঠন। কর্মক্ষম বয়সের মানুষ বেশি হলে উৎপাদনের উপর তার প্রভাব পড়ে। উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় দীর্ঘজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি হতে পারে।

(৪) স্থানান্তর গমন (Migration) : উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আবার বিপরীতক্রমে দারিদ্র ইত্যাদির কারণে কাজের সন্ধানে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে চলে যেতে চায়।

(৫) জন্ম মৃত্যুর হার (Birth and Death rate) : অনুন্নত জীবনযাত্রায় জন্মহার বেশি মৃত্যুর হারও বেশি। বিশেষত শিশু মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু, পেশাগত বিপর্যয়ের (Occupational hagard) দরুণ মৃত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● **সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Socio-Political System) :** সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক নীতি কোন দেশের জীবনযাত্রার মান স্থির করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে।

(১) সামাজিক পরিস্থিতি (Social System) : সামাজিক রীতিনীতি যেমন, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, নানা

রকম কুপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিপন্থী। বিপরীত ক্রমে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, ঐসব সামাজিক বিষয়গুলি ক্রমশ দূর হয়ে যায়।

(২) ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religion Values) : ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মের ভিত্তিতে শোষণ করার প্রবণতা, উন্নয়ন বিরোধিতা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পক্ষে প্রবল বাধা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ফলে, ধর্মীয় মূল্যবোধের ইতিবাচক দিকগুলিই কার্যকর থাকে।

(৩) জীবন শৈলী (Life style) : উন্নত জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও প্রকরণ, অনুন্নত জীবন শৈলীর চেয়ে আলাদা। কাজ, অবসর যাপন, বিনোদন, দৈনন্দিন সূচি সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যখন জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকে।

(৪) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Values) : জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে।

(৫) রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political System) : একথা প্রায় প্রমাণিত সত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে হলেও সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। বিপরীত ক্রমে এক নায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রথমদিকে দ্রুত উন্নতি হলেও শেষপর্যন্ত তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কোন প্রকারেই উন্নত হয় না।

● **বিকাশের প্রক্রিয়া (Process of Development) :** এই বিষয়টি মিশ্রভাবে অনেকগুলি বিষয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, নেতৃত্ব ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জড়িয়ে আছে।

(১) ব্যবসা বাণিজ্য (Trade) : কোন দেশের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য তথা আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ইত্যাদির উপর তার উন্নয়ন নির্ভর করে।

(২) বিকাশের অগ্রাধিকার (Developmental Priorities) : দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক দূরদর্শিতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর। উপযুক্ত অগ্রাধিকার, স্থির করার উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত হবে এবং কত দ্রুত উন্নত হবে।

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System) : কোন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক শ্রেণির মানুষ ক্রমাগতই ধনী হয়, অন্যরা ক্রমাগত দরিদ্র হয়। আবার অন্য ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সকলেরই উন্নতি হতে পারে।

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International relation) : আধুনিক পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।

(৫) সাহায্য (Aid) : আর্থিক, প্রযুক্তিগত, মেধাবিষয়ক, পেশাদারি ইত্যাদি যে কোন সহায়তাই এই বিষয়টির অন্তর্গত। অনেক সময়ই যে সব দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে অক্ষম, তারা অন্য দেশের প্রযুক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করে। যেমন, চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোন দামী যন্ত্র সাহায্য হিসাবে একটি হাসপাতালে দান করলে, তারা উন্নততর চিকিৎসা পরিসেবা দিতে পারে। অপরিশোধযোগ্য ঋণ সুদহীন ঋণ ও সাহায্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি (Scope of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি খুব একটা স্পষ্ট বা সীমিত নয়। কারণ জনসংখ্যার সঙ্গে এত অজস্র ও বিচিত্র বিষয় যুক্ত হয়ে আছে যে জনসংখ্যা সংখ্যা শিক্ষায় কি অন্তর্ভুক্ত হবে বা হবে না তা স্থির করা কঠিন। এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল।

১.৪.১ সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক (Relation between Resource and Population)

ইতিপূর্বে জীবনযাত্রার মান প্রসঙ্গে সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সম্পদ কাকে বলে, সম্পদ কত প্রকারের হয়, সম্পদের উৎপাদন, পুনর্ব্যবহার, অপচয় ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে জনসংখ্যার দ্বিমুখী সম্পর্ক বর্তমান। সম্পদের সদ্ব্যবহার হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার হয়।

১.৪.২ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics)

এই বিষয়টি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি অনেকগুলি বল দ্বারা (Force) নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে প্রধান বিষয় জন্ম ও মৃত্যুর আনুপাতিক হার, নারী ও পুরুষের অনুপাত, বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ যে বিষয়গুলি মূলত জনবিজ্ঞানের (Demography) চর্চার বিষয়। সেই সঙ্গে জানা দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি কি কি এবং প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য (Reproductive health) ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাব।

১.৪.৩ জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক (Relation between Population and Environment)

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ও দূষণের জন্য এক সময় একতরফা ভাবে দরিদ্র দেশের জনসংখ্যাকে দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক কোথায়। দূষণের প্রকৃত কারণগুলি কি কি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কি এই সব বিষয়গুলিও জনসংখ্যার শিক্ষার অন্যতম চর্চার বিষয়। কারণ জীবপরিমণ্ডলের অস্তিত্ব নির্ভর করে যে ভারসাম্যের (Ecology) উপর এবং যে খাদ্য-খাদক শৃংখল প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই শৃংখলের মধ্যে কিভাবে বিশৃংখলা দেখা দেয় তা জানা থাকলে সকলেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেস্ট হতে পারবেন। বিপরীত ক্রমে খাদ্য-খাদক শৃংখলটি সযত্নে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগী হবেন।

১.৪.৪ পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু (Curriculum and Curriculum Content)

জনসংখ্যা শিক্ষার সূচনা বিদ্যালয় স্তরেই করতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির অতিরিক্ত একটি বিষয় হিসাবে জনসংখ্যা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার অনেক সমস্যা আছে। আবার প্রচ্ছন্নভাবে অন্য বিষয়গুলির মধ্যে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করে দিলে, তাতে সত্যিকারের কোন ফল পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। সুতরাং পাঠক্রম তৈরির মূল নীতিগুলি কি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন কিভাবে করা সঙ্গত এই বিষয়টিও জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম আলোচ্য প্রসঙ্গ।

১.৪.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণ (Teaching Method and Teachers' Training)

যে কোন বিদ্যার সার্থকতা সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে যা পড়ানোর জন্য বিশেষ কিছু শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। এই কারণে শিক্ষকদের স্বতন্ত্রভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও গুরুত্ব আছে। সে হিসাবে শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণও জনসংখ্যার শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়।

১.৪.৬ মূল্যায়ন (Evaluation)

পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য আর পাঁচটা বিষয়ের মত একই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা শিক্ষার মূল্যায়ন করাতেও বেশ কিছু সমস্যা আছে। কারণ, এই বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পরীক্ষা পাশ করা নয়। চূড়ান্তভাবে এর প্রকৃত সার্থকতা তখনই বোঝা যাবে যখন জনসংখ্যা শিক্ষা সত্যিই জীবনযাত্রার মান ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। সেজন্য জনসংখ্যা শিক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থাও পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সবশেষে জনসংখ্যার উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে এবং জীবনযাত্রার মান ব্যাখ্যা করতে যেয়ে যে সব প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি বিচার করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি এতই বিস্তৃত যে, যে কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ই এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

১.৪.৭. জনসংখ্যা শিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যা (Population Education and Other Disciplines)

পূর্ববর্তী পাঠ্যাংশের আলোচনা থেকে প্রাথমিকভাবে এই ধারণা পাওয়া যায় যে জনসংখ্যা শিক্ষা অনেক বিষয় থেকেই প্রয়োজনীয়, তথ্য ও পদ্ধতি গ্রহণ করে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় এবং জনসংখ্যার শিক্ষায় তাদের অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য নিঃশেষে সমস্ত বিষয় এবং অবদান উল্লেখ করা হয়নি, এগুলি নমুনা মাত্র।

ভূগোল (Geography) : আঞ্চলিক ও ভৌত ভূগোল বিদ্যা দুই-ই আমাদের বুঝতে সাহায্য করে পৃথিবীতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে। সেই সঙ্গে কৃষি, খনিজ সম্পদ, শিল্প, শিক্ষা এগুলির বিস্তার বনাঞ্চল, নদী, পর্বত ইত্যাদি মানব জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে এবং ভূগোল বিদ্যার তত্ত্ব ও পদ্ধতি জনসংখ্যার স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে।

অর্থনীতি (Economics) : সম্পদ ও তার বণ্টন, সম্পদের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে অর্থনীতি।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান (Psychology and Social Psychology) : মানুষের আচরণের মূল নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে। দলবদ্ধ মানুষের আচরণ, তাদের বিশ্বাস, সামাজিক আচরণের চালিকা শক্তিগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে।

সমাজবিদ্যা (Sociology) : সমাজ বিদ্যার নীতিগুলি, সমাজের বিবর্তন ও উৎপত্তি, সমাজের গতিশীল স্বরূপ ইত্যাদি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জনসংখ্যার সামাজিক সত্ত্বা কি।

জন বিদ্যা (Demography) : জন সংখ্যার গঠন ও তার তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Projection), বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে।

গণিত ও রাশি বিজ্ঞান (Mathematics and Statistics) : জনসংখ্যা বিষয়ক গাণিতিক মডেল ও তথ্যের সুচারু বিন্যাস জনসংখ্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য।

জীবন বিজ্ঞান (Life Science) : জীববিদ্যা (প্রাণী বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা), শরীর বিদ্যা (Physiology) ইত্যাদি বিষয়গুলি জীব জগৎ সম্বন্ধে, প্রজনন সম্বন্ধে এবং পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে।

পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) : এই বিষয়টির সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সম্পর্ক বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞান (Education and Pedagogy) : বলা বাহুল্য জনসংখ্যা শিক্ষার মূলনীতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞানের নীতি পদ্ধতি দ্বারাই স্থির করা হয়।

১.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাবর্গ (Cognitive Domain), অনুভব বর্গ (Affective Domain) এবং সঞ্চালন বর্গ (Psychomotor Domain) নামে পরিচিত ও সেই অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যাস করার কথা শিক্ষা বিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রছাত্রীই জানেন।

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য (Cognitive Objectives) : জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানা (Knowledge) তথ্যগুলির যথাযথ বোধ হওয়া (Comprehension), তথ্যগুলির প্রয়োগ (Application) তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analysis and Synthesis) ইত্যাদির মাধ্যমে ধাপে ধাপে মূল্যায়ন (Evaluation) পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোই প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ নয়, পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য অনুধাবন করে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়, কার্যক্রম, পদ্ধতি, ইত্যাদির কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি নয়, এই বিচারবোধ তৈরি হলে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকৃত সার্থক হবে।

অনুভবমূলক উদ্দেশ্য (Affective Objectives) : জনসংখ্যা শিক্ষার অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যায় হল মূল্যবোধ গঠন (Development of value system)। অনেক জনসংখ্যা শিক্ষাবিদ্ প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যের চেয়েও মূল্যবোধ গঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে যদি মূল্যবোধ না গড়ে ওঠে তবে শুধুমাত্র জ্ঞান কোন কাজে লাগবেনা। মূল্যবোধের আচরণগত প্রকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিন্যাসের মাধ্যমে পরিস্রবণ হয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার মান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক প্রতিন্যাস (Negative attitude) এবং বাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive attitude) ব্যক্তির আচরণের ভালোমন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর পিছনে কাজ করে তাদের সামগ্রিক মূল্যবোধ। জনসংখ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করা এবং উপযুক্ত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে তোলা।

সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য (Psychomotor Objectives) : সঞ্চালনবর্গের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সৃজন (Origination)। জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিখনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যা বিষয়ে ও তার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক

বিষয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনা, কার্যক্রম স্থির করা, নিজের ও চারপাশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্রিয় ও নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করা বা অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে শিক্ষার্থীরা। সক্রিয় আচরণের আদর্শ সৃষ্টি করা, আদর্শ গ্রহণ, বর্জন ও বিচার করার মধ্যে দিয়ে যে সব কার্যক্রম, আচরণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক সেগুলিকে জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করে নেওয়াই জনশিক্ষা শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য।

বিষয়গুলি শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বিশদভাবে জেনেছেন। সেজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও জনসংখ্যা শিক্ষার যেসব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী অংশগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল।

- পরিবারের আকৃতি ছোট রাখার জন্য সচেতনতা ও প্রয়াস।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করার শিক্ষা।
- নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এবং পরস্পরের মূল্যবান ভূমিকার স্বীকৃতি।
- সুস্থ যৌন জীবন যাপন ও যৌনরোগ প্রতিরোধ করার সচেতনতার বিকাশ।
- সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় বন্ধ করার মানসিকতা।
- সকলের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিশু শ্রম বন্ধ করে মানব সম্পদ হিসাবে শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা গঠন, উদার মানসিকতার প্রসার।
- পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সক্রিয় প্রয়াস।

১.৬ জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief Hisory of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। সম্ভবত 1941 সালে Alva Myrdal তাঁর গ্রন্থে (Nation and Family, 1941) আমেরিকার জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য জনসংখ্যা নীতি (Population Policy) একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর। বিশেষভাবে পারিবারিক জীবন যাপনের শিক্ষার উপর। কিন্তু পরবর্তী দুই দশক বিষয়টি নিয়ে আর কোন উদ্যোগ বা চিন্তাভাবনা দেখা যায়নি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Tachers College Record (March, 1962) নামক পত্রিকায় Warren S. Thomson জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অপর একটি প্রবন্ধ Population-Gap in the Curriculum লেখেন Philip M. Hanser ; এরা দুজনেই বিদ্যালয় পাঠক্রমে

জনসংখ্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 1964 সালে বিদ্যালয়ে জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক Sloan Wayland যিনি Teaching Population Dynamics ও Critical stages of Reproduction নামক দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন প্রধানত শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বিস্তার করতে পারেনি। UNESCO-র প্রধান (Director General Sir Julian Huxley) 1948 সালে যে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন নির্বিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতাকে প্রবলভাবে ক্ষতি করতে পারে। তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন অপুষ্টি, ভূমিক্ষয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের সম্ভাবনা সম্পর্কে। তিনিও জনসাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু 1968 সালের পূর্বে UNESCO এই প্রসঙ্গে আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। 1968 তে UNESCO-র সাধারণ অধিবেশনে জন সাধারণকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে সচেতন করা ও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। এবং 1970 সালে মহা নির্দেশককে দায়িত্ব দেওয়া হয় যাতে সমস্ত সদস্য দেশগুলিকে সচেতনভাবে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তার জন্য। দুই বছর পর 1972 সালে জনসংখ্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য ও শিক্ষার প্রসঙ্গে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য, জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত দেশকে যাতে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে মহানির্দেশকের উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এর মধ্যে 1970 সালে ব্যাঙ্ককে UNESCO-র এশিয়া আঞ্চলিক অফিসে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় 'The Workshop on Population and Family Education নামে। এই হিসাবে বর্তমান জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃত সূচনা ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এখানে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে আছে—

- জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়।
- জনসংখ্যা শিক্ষার সাংগঠনিক উদ্যোগের পদ্ধতি।
- বিদ্যালয় পাঠক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষার রূপরেখা স্থির করা।
- সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠক্রমে জনসংখ্যার উপাদানগুলি সংযোজন ও চিহ্নিত করে বিষয়বস্তুর একটি খসড়া তৈরি করা।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম জনসংখ্যা শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি হয়। তবে বিভিন্ন দেশে এই বিষয়টিকে বিদ্যালয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা খুব সহজ হয়নি। প্রবল বাধা আসে গোঁড়া নৈতিকতার অজুহাতে এবং নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণের অনীহা থেকে। শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক সকলেই এর বিরোধিতা করেছেন এক সময়ে যার কিছুটা এখনও বিদ্যমান। প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে প্রথমে পাঁচটি দেশ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর করে এবং United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)-এর আর্থিক সহায়তায় ও UNESCO-র প্রযুক্তিগত সাহায্যে নানা কর্মশালার আয়োজন হয়। 1983 সালের মধ্যে পঁচিশটি দেশে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম গৃহীত হয় যা বিগত কুড়ি বছরে ক্রমবর্ধমান।

প্রথম যে সমস্ত দেশে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় ভারত তার মধ্যে অন্যতম। The Family Planning

Association of India মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে জনসংখ্যা শিক্ষাকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করে। তার ভিত্তিতে এই বিষয়ের আনুকুল্যে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। তবে তাতে স্পষ্ট বলা হয় যে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া নয়।

1969 সালে বর্তমান মুম্বাই শহরে প্রথম জনসংখ্যা শিক্ষার জাতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তার ভিত্তিতে মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রক UNFPA'র আর্থিক সহায়তা National Population Education Programme চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ রাজ্যেই জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জীবনশৈলী শিক্ষা (Life Style Education) নামে বিষয়টি প্রচলিত। এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমগুলিতে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই জনসংখ্যা শিক্ষাকে অন্যতম বিষয় হিসাবে স্থান দিয়েছে।

১.৭ ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম (Programmes of Population Education in India)

জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বলা হয়েছে, 1969 সাল থেকে ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রনেতারা চিন্তিত ছিলেন। সেজন্য 'পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম' (Family Planning Programme) দীর্ঘকাল পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকলেও তাতে শিক্ষার কোন ব্যাপার ছিল না। মূলত প্রচার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কখনও কখনও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চিকিৎসার সুযোগ বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রিত হলেও বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যে তার বিশেষ প্রভাব পরেনি।

পরোক্ষভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্যও ছিল সামগ্রিকভাবে জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করা, এবং জাতীয় অগ্রগতির বাধাগুলি অপসারিত করা। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই এই বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 2001 সালে সর্বশিক্ষা অভিযানের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্যকে সফল করবে। কারণ বর্তমানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে শিক্ষার প্রসারের ফলে জন্মহার ক্রমশ কমতে থাকে।

শিশুশ্রম নিরোধক আইন, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত পদক্ষেপগুলিই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকি দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ রোজগার যোজনা, গ্রামীণ আবাসন যোজনা ইত্যাদি যা কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে তাও সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই। এক কথায় বলা চলে।

● একদিকে সরাসরি জনসংখ্যা শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়টিকে পঠন-পাঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

● অন্যদিকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের সার্বিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিশ্চিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি।

● আর সেই সঙ্গে AIDS প্রভৃতি মারণ রোগ প্রতিরোধ করার মাধ্যমেও বিদ্যালয় বহির্ভূত পদ্ধতি জনসংখ্যা শিক্ষার পরোক্ষ আয়োজন করা হচ্ছে।

১.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ প্রধানত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টির ধারণাগত ভিত্তি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। জনসংখ্যাকে বিপদ হিসাবে চিন্তা না করে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা এই পরিবর্তন সূচিত করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদকে আরও কার্যকর ও ক্ষমতাশালী করে তুললে জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হবে— এই ধারণাই জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি।

জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবনের মান সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাবের প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা শিক্ষায় স্থান পেয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও এই সংজ্ঞায় পরিবার পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে সম্পর্কিত। জীবনযাত্রার মান প্রধানত পাঁচটি সূচক দ্বারা নির্মিত হয়। যেমন, সম্পদ, জীবন যাপনের স্তর, জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিকাশের প্রক্রিয়া। এই পাঁচটি সূচক আবার পাঁচটি করে উপসূচকের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য বলা হয় জীবনযাত্রার মান একটি জটিল পরিবর্তনশীল ও কখনও আপেক্ষিক ধারণা।

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে আছে, সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক, জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি, জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক, পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সবশেষে মূল্যায়ন। জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি অন্যান্য বিষয় থেকে অনেকাংশে গৃহীত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে ভূগোল, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, জনবিদ্যা, গণিত ও রাশিবিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের দ্বারা স্থির করা হয়। এই তিনটি প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক ও সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বিভিন্ন লেখক বলেছেন তার মধ্যে আছে, পরিবার সীমিতকরণ, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন, নারী-পুরুষের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সুস্থ যৌন জীবন যাপন, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি।

সবশেষে জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এর উৎপত্তি ও বিস্তারের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং

UNESCO'র ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সবশেষে।

১.৯ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার একটি সংজ্ঞা দিন।
(খ) জনসংখ্যাকে আপদ হিসাবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গিটি কী?
(গ) সম্পদ কথাটির অর্থ কী?
(ঘ) স্বাস্থ্যের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক কী?
(ঙ) বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার গঠন কাকে বলে?
(চ) জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা কী?
(ছ) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কাকে বলে?
(জ) ভূগোলের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সম্পর্ক কী?
(ঝ) জনসংখ্যা শিক্ষায় জনবিদ্যার অবদান কী?
(ঞ) জনসংখ্যা শিক্ষার যে সব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আছে তার যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।
(ট) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে Sloan Wayland-এর ভূমিকা কী?
(ঠ) UNFPA কী?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে সংকীর্ণ বলা হয়েছে কেন?
(খ) জীবনযাপনের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের স্তর কীভাবে বিচার করা হয় আলোচনা করুন।
(গ) জীবন যাপনের মান ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(ঘ) শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষণ ও মূল্যায়নকে কেন জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
(ঙ) জনসংখ্যা শিক্ষায় অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(চ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে UNESCO'র ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।
(খ) উদাহরণসহ জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করুন।
(গ) জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) জীবনযাপনের মান যে সব সূচকের উপর নির্ভরশীল তা বিশদভাবে আলোচনা করুন।
(ঙ) জনসংখ্যার শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি উল্লেখ করুন।

একক ২ □ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics)

গঠন (Structure)

২.১ সূচনা
২.২ উদ্দেশ্য
২.৩ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
২.৩.১ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির সংজ্ঞা
২.৩.২ জনসংখ্যার উপাদান
২.৪ জনবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য
২.৪.১ জনসংখ্যার আকৃতি
২.৪.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
২.৪.৩ আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও বৃদ্ধি
২.৪.৪ জন ঘনত্ব
২.৪.৫ বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গঠন
২.৪.৬ নারী ও পুরুষের অনুপাত
২.৫ জনসংখ্যার পরিবর্তন
২.৫.১ জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান
২.৫.২ জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণ
২.৬ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
২.৬.১ পরিবার পরিকল্পনা
২.৬.২ শিক্ষা
২.৬.৩ প্রজননগত স্বাস্থ্য
২.৬.৪ নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা
২.৭ সার সংক্ষেপ
২.৮ অনুশীলনী

২.১ সূচনা (Introduction)

জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। জনবিজ্ঞান (Demography) নামক একটি বিদ্যার প্রধান চর্চার বিষয় জনসংখ্যা সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যাদান ও সমাজ, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রভাব আলোচনা করা। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিজ্ঞানসম্মত বিচার করে দেশের পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করা। জনসংখ্যা কেন বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে আনুপাতিক অবস্থার কেন পার্থক্য লক্ষ করা যায় এবং তার ফলে কী কী ঘটতে পারে, এই বিষয়টি জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম আলোচনা বিষয়। কারণ ব্যক্তি ও অন্যান্য জৈবিক, সামাজিক ও ভৌত পরিমণ্ডলের মধ্যে যে সম্পর্ক তার অন্যতম নিয়ন্ত্রণ শক্তি নিহিত আছে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির মধ্যে। এই প্রসঙ্গটিই বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কাকে বলে বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রজননগত স্বাস্থ্য ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

২.৩ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি (Population Dynamics)

সূচনাতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে অন্যান্য আলোচনার পূর্ব এই কথাটির একটি সংজ্ঞা স্থির করা আবশ্যক।

২.৩.১ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির সংজ্ঞা (Definition of Population Dynamics)

স্বতন্ত্রভাবে এই কথাটির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। তবে নানা সূত্র থেকে দেখা যায় যে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি অনুধাবন করার অর্থ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যের একটি কার্যকারণ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস এবং সেইসঙ্গে জনসংখ্যার নিয়ামক শক্তিগুলি চিহ্নিত করে জনসংখ্যার প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা। বিষয়টি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যেমন, আমরা ছোটবেলাতেই শিখেছি যে নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চলে জনঘনত্ব সবসময়ই দুর্গম অনুর্বর অঞ্চলের চেয়ে বেশি। কিন্তু বাইরের নিয়ামক শক্তি ছাড়াও জনসংখ্যার গঠন ও বৈশিষ্ট্যের একটি আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা নিয়ামক শক্তি আছে। একেই জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ Population dynamics is the process of population changes due to the forces within population itself (জনসংখ্যার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বলা যায় জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি)।

২.৩.২ জনসংখ্যার উপাদান (Components of Population)

জনবিজ্ঞানে জনসংখ্যা পরিবর্তনের অনেকগুলি উপাদানের কথা বলা হয়।

নারী পুরুষের মোট সংখ্যা (Number of male and female population)

নারী ও পুরুষের অনুপাত (Ratio of male and female population)

জন ঘনত্ব (Population density)

অঞ্চল ভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাত (Proportion of population according to region)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Growth rate of population)

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার গঠন (Age structure of population)

বয়সভিত্তিক নারী ও পুরুষের আনুপাতিক গঠন (Age based comparative structure of male and female population) পরবর্তী অংশে এই সাতটি উপাদানের ভিত্তিতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে।

২.৪ জনবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য (Demographic Characteristics)

বিশ্বের জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমবর্ধমান। এই পরিবর্তনশীল সংখ্যার হিসাব দেওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপাতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।

২.৪.১ জনসংখ্যার আকৃতি (Size of the Population)

প্রাচীন ভারতে আর্যসভ্যতার বিকাশের পূর্ব থেকেই ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মনে করা হয় আর্যদের আগমনের এবং আর্য সভ্যতা বিস্তারের পর ভারতে উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং মৃত্যুর হার ছিল কম। তার ফলে গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus (490 B.C.) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় 34টি শহরে পাঁচ হাজার নাগরিকের বসবাস করার কথা লিখেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (321-297 B.C.) সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। তার অর্থ সেই সময় থেকে ভারত ছিল জনবহুল দেশ। পন্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব 300 বছরের সময় ভারতের জনসংখ্যা দশ থেকে চৌদ্দ কোটির মধ্যে ছিল। Davis যুক্তি সহ দাবি করেন 1600 খ্রিস্টাব্দে ভারতে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে বারো কোটি যা দাশগুপ্তর মতে আরও এক কোটি বেশি। 1871 সালে ভারতে প্রথম আদম শুমারি হলে দেখা যায় জন সংখ্যা ২৫.৫ কোটি। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক একশত চার কোটির মত (2001-এর আদমশুমারি অনুযায়ী 101 কোটি) এর খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে জনগণনার দশ বৎসরান্তিক রিপোর্টগুলিতে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য জনসংখ্যার আকৃতির চেয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যাবে।

২.৪.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Growth rate of Population) : 1891 সাল থেকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর তিনটি পর্যায় আছে। প্রথমটি 1891 থেকে 1921 পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি 1921-1951 পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়টি 1951-এর পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম পর্যায়ে বৃদ্ধির হার ছিল খুবই সামান্য। এমনকি প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য মহামারীর দরুণ 1921 সালের জনগণনায় দেখা যায় 1911 সালে 25.2 কোটির তুলনা হ্রাস পেয়ে 1921 সালে জনসংখ্যা নেমে এসেছে 25.13 কোটিতে। তারপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়তে থাকে। 1921 থেকে 1951 পর্যন্ত বৃদ্ধির হার 1.04 থেকে 1.33 এর মধ্যে। কিন্তু 1951 সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত বাড়তে থাকে। 1981 সালে তা বেড়ে হয় 2.25। স্বাধীনতার পর 1947 সালে জনসংখ্যা আনুমানিক 34.25 কোটি থেকে 1981 সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয় (68.52 কোটি)। জন সংখ্যা বৃদ্ধির এই হার প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বিগত কুড়ি বছরে জনসংখ্যা আবার প্রায় দ্বিগুণিত হওয়ার মুখোমুখি।

২.৪.৩ আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও বৃদ্ধি (Regional Population and its growth)

আমাদের দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়। ভারতীয় জনগণনায় সমগ্র দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়—উত্তর, পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ। এর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে মধ্যাঞ্চল সবচেয়ে বড় (737254 বর্গ কিলোমিটার) এবং পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে ছোট (508050) এর কারণ অবশ্য এই যে পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রই দুইটি বৃহৎ রাজ্য মাত্র। রাজ্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পূর্বাঞ্চলে (13টি) যাদের মোট আয়তন 688140 বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে জনসংখ্যারও ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি মোট জনসংখ্যার প্রায় 26%। সে তুলনায় উত্তরাঞ্চলে 12%, মধ্যাঞ্চলে 24% পশ্চিমাঞ্চলে 14% এবং দক্ষিণাঞ্চলে 24% জনসংখ্যার বসতি। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। সমতলের কৃষিবহুল অঞ্চলে বসতি সবচেয়ে বেশি। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিহার (ঝাড়খণ্ডসহ), উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে খুবই বেশি।

২.৪.৪. জন ঘনত্ব (Density of Population)

মোট জনসংখ্যাকে মোট ভৌগোলিক আয়তন দিয়ে ভাগ করে জন ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান এবং সেটাই স্বাভাবিক। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। সিকিম, মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, প্রভৃতি রাজ্যগুলির জনঘনত্ব খুবই কম। সবচেয়ে কম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এর কারণগুলি ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্যে নিহিত আছে। তার একটি বিষয় হল স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ স্বাচ্ছন্দ থেকে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এবং নগরায়ণের দ্রুত প্রসার হওয়ার দরুণ নাগরিক জনঘনত্ব গ্রামের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যেও বৃহৎ শহরগুলির জনসংখ্যা ও ঘনত্ব ছোট শহরগুলির তুলনায় বেশি।

৪.২.৫ বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গঠন (Age and sexwise Composition)

যদিও সেনসাস প্রতিবেদনে পাঁচ বছর বয়সের ব্যবধানে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে, তবুও তিনটি প্রধান বিভাগ দেশের জনসংখ্যার প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। কর্মক্ষম বয়সের কম, কর্মক্ষম বয়স, কর্মক্ষম বয়সের পরবর্তী স্তর, এই তিনটি বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কর্মক্ষম বয়স বলতে সাধারণত 15 থেকে 60 বৎসর সীমারেখা ধরা হয়। কিন্তু এই বিষয়টি কিছুটা অস্পষ্ট ও পরিবর্তনশীল। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, জীবন প্রত্যাশা (Life expectancy) বৃদ্ধি, উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা, পুষ্টি ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও কর্মক্ষমতার কোন বয়স ভিত্তিক সীমারেখা

টানা যায় না। বিষয়টির গুরুত্ব এখানেই যে কর্মক্ষমতার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে কর্মক্ষমতার এই ঊর্ধগতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

যাইহোক অন্যান্য দেশের মত ভারতেও 14 বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (প্রায় 39-40%)। এর তাৎপর্য এই যে জন্মহার, এখনও যথেষ্ট বেশি এবং শিশু মৃত্যুর হারও বেশি। এর ফলে সমস্ত শিশু কর্মক্ষম বয়সে পৌঁছাতে পারে না। ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় 7% এবং মধ্যবর্তী অংশের সংখ্যা 53-54%। এই অনুপাত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে ভিন্ন। বলা বাহুল্য এই অনুপাত ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। বয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে ক্রমবর্ধমান যা উন্নত জীবনযাপনের অন্যতম সূচক। কারণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মৃত্যুহার কমে যাওয়া, অবসর জীবনের সুরক্ষা ও নিশ্চিত ব্যবস্থা এসবই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অঙ্গ এবং এর ফলেই কোন সমাজে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে।

২.৪.৬. নারী ও পুরুষের অনুপাত (Proportion of male and female Population)

ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ সন্তানকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে স্ত্রী সন্তানকে অবাঞ্ছিত আপদ মনে করা। এর প্রতিফলন দেখা যায় জনসংখ্যার নারী ও পুরুষের আনুপাতিক অবস্থানে। একমাত্র কেরল ছাড়া ভারতের সমস্ত রাজ্যে প্রতি এক হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অধিকাংশ উন্নত সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। কারণ শিশু মৃত্যুর হার খুব কম হওয়ায় এবং ছেলে ও মেয়ে সমানভাবে লালিত হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। অন্ততঃপক্ষে সমান সমান থাকে।

আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব খুব ব্যাপক। তারজন্য কন্যা ভ্রূণ হত্যার অসংখ্য ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে। সদ্যোজাত কন্যা সন্তান হত্যা ও পরিত্যাগ করার ঘটনাও বিরল নয়। জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করে উভয়ের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস গঠন। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ভারতীয় জীবনযাত্রার মান এখনও যথেষ্ট উন্নত নয়। বহু সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার এখনও দূর না হওয়াই এই ধরনের বৈষম্যের প্রধান কারণ।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিসংখ্যান অপেক্ষা বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি কারণ পরিসংখ্যান সদা পরিবর্তনশীল। তাছাড়াও জনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে জন্য জনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিই এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

২.৫ জনসংখ্যার পরিবর্তন (Changes in Population)

একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যগুলি সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন একমুখী নয়, বহুমুখী। শুধু মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি নয় তার পাশাপাশি নানা আনুপাতিক পরিবর্তনও ক্রমাগত ঘটে চলেছে। প্রশ্ন হল, এই পরিবর্তন কেন ঘটে? জনসংখ্যার পরিবর্তনের পিছনে উন্নয়নের যেমন পরোক্ষ ভূমিকা থাকে তেমনি কিছু কিছু প্রত্যক্ষ কারণে পরিবর্তন হয়। তার পূর্বে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

২.৫.১. জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান (Components of Population Change)

যে সমস্ত উপাদান জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল,

প্রজনন ক্ষমতা (Fertility) : সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে বলা হয় প্রজনন ক্ষমতা। কখনও কখনও গর্ভধারণ ক্ষমতা (Natality) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য শব্দটি নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য ও গৌণ যৌনাঙ্গের পরিনমণ, হরমোনের সক্রিয়তা প্রজনন ক্ষমতার সূত্রপাত ঘটায়। পুরুষের প্রজনন ক্ষমতাও একইভাবে জন্মায় তবে সাধারণত মেয়েদের চেয়ে দুই বৎসর পরে। নারীর প্রজনন ক্ষমতার সময় সীমা খুব স্পষ্ট ও প্রায় আকস্মিকভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। অপরপক্ষে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে কমতে থাকে।

এছাড়াও প্রজনন সক্ষমতা (Facundity) ও প্রজনন ক্ষমতার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করা হয়। প্রথমটি হল নারী জীবিত সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আর দ্বিতীয়টির অর্থ প্রকৃত জন্মদানের ক্ষমতা। প্রজনন ক্ষমতার সঙ্গে পরিবারের আকৃতি (Family size), জন্মক্রম (Birth Order) এবং বন্ধ্যাত্ব (Infertility) এই শব্দগুলিও যুক্ত। পরিবারের গঠনের ক্ষেত্রে জন্মক্রমের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ পরপর সন্তানের মধ্যে বয়সের পার্থক্য, লিঙ্গের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবারের সন্তানদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেমন, প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তার উপর সাংসারিক দায়িত্ব ছোটবেলা থেকেই বেশি পড়ে (বিশেষ আর্থ সামাজিক অবস্থায়), তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবহেলিত হয়।

প্রজনন ক্ষমতার বিশ্লেষণ করার জন্য (Fertility analysis) কয়েকটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে এক বছরে যত জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার সংখ্যাকে বছরের মাঝামাঝি যে মোট জন সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 1000 দিয়ে গুণ করে স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয়।

সাধারণ প্রজনন হার (General Fertility Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে এক বছরে যত জীবিত শিশু জন্মায় তার সংখ্যাকে 15-44 বৎসর বয়সী যত নারী (বছরের মাঝামাঝি) আছে তার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 1000 দিয়ে গুণ করে সাধারণ প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

বয়স বিশেষের প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) : সাধারণ প্রজনন হারের মত একই। শুধু ছোট ছোট বয়ঃসীমার জন্য (যেমন, 15-19, 20-24 ইত্যাদি) আলাদা করে প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate) : পূর্বোক্ত বয়সভিত্তিক প্রজনন হারগুলির যোগফলকে নারীর প্রতি হার হিসাবে প্রকাশ করার পদ্ধতি। অর্থাৎ যদি বয়ঃসীমা 5 বছর হয় তবে 5 দিয়ে যোগফলকে গুণ করে মোট প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

উপরোক্ত পরিমাপগুলির সাহায্যে আরও কিছু সূচক ব্যবহার করে জনসংখ্যা ও প্রজনন বিষয়ক বিশ্লেষণ করা হয়। অঞ্চল ভিত্তিতে সূচকগুলি আলাদা এবং প্রজনন হারের সঙ্গে আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গ খুবই জরুরি।

প্রজনন ও আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গ (Fertility and Socio-economic Relevance) : এখানে পাঁচটি সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও প্রজনন ক্ষমতা (Education and Fertility) : শিক্ষার সঙ্গে প্রজনন ক্ষমতার বিপরীত সম্পর্ক।

উচ্চশিক্ষিত জনগণের ক্ষেত্রে প্রজনন কম। কারণ শিক্ষা উন্নত জীবনযাপনের প্রেরণা দেয়। শিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ও অনেকটা প্রয়াস ব্যয় হয় এবং বিবাহের বয়স পিছিয়ে যায়।

আয় ও প্রজনন ক্ষমতা (Income and Fertility) : মাথাপিছু আয় বেশি হওয়ার অর্থ পরিবারের আকৃতি সীমিত রেখে মাথাপিছু অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দের নিশ্চিত ব্যবস্থা। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবেও উচ্চ আয়ের মানুষ পরিবার সীমিত রাখেন।

পেশা ও প্রজনন (Occupation and Fertility) : উচ্চবৃত্তি অবলম্বনকারী পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত থাকে। এদের বৃত্তির প্রয়োজনে জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখতে হয়, বিনোদনের অনেক সুযোগ থাকে এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখতে হয়।

বিবাহের বয়স ও প্রজনন (Age of Marriage and Fertility) : বাল্যবিবাহ বহু শিশুর জন্ম ও উচ্চহারে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সেজন্য দেরীতে বা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হলে পরিবারের আকৃতি সীমিত থাকে। অভিজ্ঞতার দরুণ শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনাও কমে। সম্প্রতি ভারতে বাল্য বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবল চেষ্টা রাষ্ট্রীয় স্তরে লক্ষ করা যাচ্ছে যা প্রজনন সংক্রান্ত অজস্র সমস্যা সৃষ্টি করবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সামাজিক আন্দোলন ও প্রজনন (Social Movement and Fertility) : বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে প্রজননের হার কমায়। যেমন, সাক্ষরতা আন্দোলন, শিশুশ্রম বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আন্দোলন ইত্যাদি।

মরণশীলতা (Mortality) : শুধুমাত্র জন্ম হার নয় পাশাপাশি মৃত্যুর প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মরণশীলতার অনেকগুলি পর্যায় আছে। যেমন,

ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু (Foetal death) : জন্মের পূর্বে গর্ভকাল সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যু। এর মধ্যে আছে মৃতসন্তানের জন্মদান (Still birth), গর্ভস্রাব (Micarriage) এবং গর্ভপাত (Abortion)।

সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু (Neonatal death) : সাধারণত umbilical cord ছিন্ন করার আগেই অথবা জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু। কখনও দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হলেও তাকে সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু বলা হয়।

শিশু মৃত্যু (Infant death) : সাধারণত পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু। তবে এই বয়ঃসীমার কোন স্থিরতা নেই। ভারতে কন্যা ভ্রূণ হত্যা (Abortion of female foetus), সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু ও শিশুর মৃত্যুর হার খুবই বেশি।

মরণশীলতার জন্য কয়েকটি সূচক ব্যবহার করা হয়।

স্থূল মৃত্যু হার (Crude Death Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যা ও জনসংখ্যার অনুপাতকে 1000 দিয়ে গুণ করে স্থূল মৃত্যু হার নির্ণয় করা হয়।

বয়সভিত্তিক মৃত্যু হার (Age Specific Death Rate) : কোন বয়স সীমার মৃত্যু হার। পদ্ধতি স্থূল মৃত্যু হার নির্ণয়ের অনুরূপ। শুধু নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে সমস্ত গণনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

বয়সভিত্তিক মরণশীলতার হার (Age Specific Mortality Rate) : কোন বয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা কতটা।

জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা (Expectation of life at Birth) : গড়পরতা একটি শিশু কত বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের প্রত্যাশা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানান্তর গমন (Migration) : কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে অঞ্চলে সাধারণত স্থায়ীভাবে বসবাস করে জীবিকা বা অন্যকোন কারণে সে বা তারা যদি অন্যত্র সাময়িকভাবে অথবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য বসবাস করতে থাকে তবে তাকে বলা হয় স্থানান্তর গমন। যদি এক দেশের মানুষ অন্যদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যায় তবে তাকে বলা হয় অভিবাসন (Immigration)। আবার কখনও আইন সঙ্গতভাবে বসবাস না করে বিনা অনুমতিতে অন্যদেশে বসবাস করার নাম অনুপ্রবেশ (Infiltration)। এই তিন প্রকার স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান। জন বিজ্ঞানের এই তিন প্রকার স্থানান্তর গমনকে বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন (International Migration) : আইনানুগ পথে এক দেশ থেকে অন্যদেশে স্থায়ীভাবে সপরিবারে বসবাস।

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন (Internal Migration) : নিজের দেশেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করা। ভারতীয় সংবিধানে বিষয়টি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

স্থানীয় চলাচল (Local movement) : মূলত জীবিকার প্রয়োজনে অল্পকালের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করা। যেমন, ফসল বোনা বা কাটার জন্য দলে দলে শ্রমিকদের পশ্চিমবঙ্গে আসা।

এরমধ্যে স্থানীয় চলাচলের জন্য জনসংখ্যার গঠনে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অন্য দুই প্রকার স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানান্তর গমন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াও যথেষ্ট জটিল এবং বর্তমান পাঠের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। শুধু মনে রাখতে হবে পার্শ্ববর্তী দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি কোন মৌলিক ভেদ না থাকে তবে স্থানান্তর গমন সকলের অজ্ঞাতেই কোন দেশের জন গোষ্ঠীর প্রকৃতিতে পবিরর্তন আনতে পারে। ভারতে অভিবাসনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশ থেকে। এই সব দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীই এর কারণ। পশ্চিমাঞ্চলে অভিবাসন সেদিক থেকে কিছুটা কঠিন।

২.৫.২. জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ (Causes of Population Change)

একথা ইতিমধ্যেই পরিস্কার যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলির মধ্যেই পরিবর্তনের কারণগুলি নিহিত আছে। প্রজনন তথা জন্ম হার, মৃত্যুর হার, স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে। এছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা দরকার।

আঞ্চলিক বিকাশ (Regional Development) : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের মধ্যে অসাম্য থাকলে একদিকে যেমন, উপরোক্ত তিনটি উপাদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তেমনি অনুন্নত এলাকা থেকে উন্নত এলাকায় যেয়ে বসবাস করার প্রবণতা বাড়ে। এই কথাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আবহাওয়া (Climate) : প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ স্থান (যেমন, বন্যাপ্রবণ বা নদীর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা অনেকের কাছে বসবাসের পক্ষে অনুপযোগী মনে হতে পারে। কিন্তু তাছাড়াও এই সব অঞ্চলে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত বেশিও হতে পারে।

পেশা (Occupation) : নিজের পেশার উপযোগী কাজ না থাকলে স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বাড়ে। অথবা অধিক স্বচ্ছলতার আশাতেও স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বাড়ে।

সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) : সামাজিক নিরাপত্তার অভাব স্থানান্তরগমনের প্রবণতা বাড়ায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য কারণগুলি জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৬ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Population Control Measures)

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই প্রধান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। কিন্তু এছাড়াও নানাভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা ছিল পরিবার পরিকল্পনা।

২.৬.১. পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) :

দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবার পরিকল্পনাই ছিল একমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ ইচ্ছামত বা পূর্ব পরিকল্পনা মত সন্তান ধারণ ও পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখার প্রয়াস। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়।

দুটি সন্তানের বেশি সন্তান না হওয়ার পরিকল্পনা।

প্রথম সন্তানের জন্ম একটু দেরিতে।

দ্বিতীয় সন্তান আরও চার পাঁচ বছর পরে।

পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি হিসাবে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আছে,

প্রচার (Publicity) : বিজ্ঞাপন, রেডিও, হোর্ডিং, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার', জাতীয় শ্লোগান প্রচার করা। ছোট পরিবারের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা, প্রচার ও জনমত তৈরি করার প্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি সরকারই তার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে। প্রচারের সুফল কিছুটা পাওয়া গেলেও সর্বত্র তা সমানভাবে কার্যকর হয়নি।

জন্ম শাসন (Birth Control) : ঔষধ ও নানা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে (যেমন, কন্ডোম, কপার-T ইত্যাদি ব্যবহার) জন্মশাসন করার চেষ্টা। বিনামূল্যে কন্ডোম বিতরণ ও তার ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রচার করায় কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও তা সর্বত্র সমান জনপ্রিয় হয়নি। ঔষধ প্রয়োগ খুবই কার্যকর পদ্ধতি হলেও, ঔষধ ব্যয় সাপেক্ষ হওয়াতে তা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে আয়ত্তাধীন ছিল না।

শল্য চিকিৎসা (Operation) : দুটি সন্তান জন্মের পর নারীদেহের ফ্যালোপিয়ান টিউবে অপারেশন করে ডিম্ব নিঃসরণের পথ বন্ধ করার পদ্ধতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে খুবই নিশ্চিত পদ্ধতি। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অপারেশনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অমূলক ভয়, কুসংস্কার দুটি সন্তানেরই মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে অনেকেই অপারেশন করাতে অনীহা প্রকাশ করে। পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ভ্যাসেক্টমি যা যৌন ক্ষমতা বজায় রেখেও শুক্র নিঃসরণের পথ বন্ধ করে দেয়, একই কারণে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কারণ একবার অপারেশনের পর আর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যায় না।

২.৬.২. শিক্ষা (Education)

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার শিক্ষার বিস্তার। স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ষাট বছরে শিক্ষার

প্রভূত বিস্তার হলেও এখনও বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। শিক্ষা নানাভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

- শিক্ষা মানুষের রুচি, উন্নত জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
- শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটায়।
- শিক্ষার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলে পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়ায় এবং সম্পর্ক দৃঢ় করে।
- সন্তান পালনের যৌথ দায়িত্ব শিক্ষার ফলেই সম্ভব।
- শিক্ষা উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং তার সদ্ব্যয় করার মানসিকতা তৈরি করে।
- শিক্ষা মানুষকে যুক্তি পরায়ণ, তথ্য নির্ভর করে তোলে। ফলে তার পক্ষে পরিপার্শ্বিক সবকিছুকে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষা মানুষকে সুস্থ অবসর যাপন ও বিনোদনে অনুপ্রাণিত করে।

এই সব কিছুই পরিবার সীমিত রাখার পক্ষে সহায়ক।

২.৬.৩. প্রজননগত স্বাস্থ্য (Reproductive Health)

প্রজননগত স্বাস্থ্য মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ যৌন জীবন যাপন এবং দ্বিতীয়ত যৌনতাবাহিত রোগ সম্বন্ধে সচেতন থেকে সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া।

সুস্থ যৌন জীবন যাপনের প্রাথমিক শর্ত প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান। এজন্য প্রত্যেক দম্পতিরই উচিত যৌনাঙ্গ ও প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়া। প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যৌথভাবে শিখে নেওয়া। দ্বিতীয় শর্ত, যৌন জীবন যাপনের জন্য সুস্থ মানসিকতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া। এই বিষয়টি পরস্পরকে জানা ও বোঝার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় যা প্রত্যেক দম্পতিরই অবশ্য কর্তব্য। তৃতীয় শর্ত, পরিচ্ছন্নতা। যৌন জীবনে পরিচ্ছন্নতা বহু ব্যাধি, সংক্রমণ ও সমস্যার সম্ভাবনা দূর করে দেয়। সুস্থ যৌন জীবনের চতুর্থ শর্ত বিশ্বস্ততা। বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুক্ত আছে যৌনতা বাহিত মারণ ব্যাধিগুলির বিস্তার। AIDS (Acquired Immuns Deficiency Syndrome) যা HIV নামক Virus রক্ত অথবা যৌনাঙ্গের মাধ্যমে দেহে সঞ্চালিত হয়ে সৃষ্টি হয়, এমনই একটি মারণ ব্যাধি।

AIDS সম্বন্ধে বর্তমানে সমস্ত শিক্ষিত মানুষেরই প্রাথমিক জ্ঞান আছে একথাও বহুবিদিত যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বর্তমানে HIV বাহক। তারা যে কোন সময়ই AIDS আক্রান্ত হতে পারে। নিজেদের অজ্ঞাতে অন্যের দেহে HIV সংক্রামিত করতে পারে। জনসংখ্যা শিক্ষা বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই এই বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুস্থ যৌন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বস্ততার মানসিকতা তৈরি করায় সাহায্য করতে পারে।

AIDS ছাড়াও আরও দুটি জীবাণু ঘটিত যৌনতা বাহিত ব্যাধি প্রজননগত স্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতি করতে পারে। এগুলি হল Syphilis (সিফিলিস) ও Gonoria (গনোরিয়া)। কিন্তু বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবন ও প্রাক্‌বিবাহকালীন সুস্থজীবন যাপন সহজেই এই জাতীয় ব্যাধিকে দূরে রাখতে পারে। সিফিলিস রোগে অনেক সময়ই দীর্ঘকাল ধরে কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। ধীর ধীরে Treponema Pallidum নামক জীবাণু, যা সিফিলিসের কারণ, যৌনাঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে ক্ষত সৃষ্টি করে। কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। এর পর দেহসন্ধিতে ব্যথা, চুলপড়া, হাতে

বা পায়ে কড়া পরা এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কারণ হয়। প্রথমদিকে ধরা না পড়লে সিফিলিস দুরারোগ্য ব্যধির সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে গনোরিয়া থেকেও সিফিলিস বিপজ্জনক। আর একটি সম্ভাবনা হল সিফিলিস। শিশু জন্মের সময়, নবজাতককে সংক্রামিত করতে পারে। তার ফলে অন্ধত্ব ও অন্যান্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজননগত স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম হয়, তার মরণশীলতা কমে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জন্মহার কম হয় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৬.৪. নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা (Women empowerment and Self reliance)

যে সমাজে নারীরা যত অসহায়, সেই সমাজে জন্মহারও বেশি। নারী পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অবস্থায় তার ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান ধারণে বাধ্য হয়। কখনও কখনও চূড়ান্ত শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও তার পক্ষে এছাড়া কোন উপায় থাকে না। ভারতে এই একটিমাত্র কারণেই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এখনও আশানুরূপ নয়। এই জন্য নানাভাবে আইনি পথে এবং সামাজিক আন্দোলনের পথে নারীকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে তারা কিছু স্বাধীনভাবে নিজেদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু নির্ভরতা না কমলে, শুধুমাত্র সুযোগ থাকলেই সাধারণ মানুষ এর সুযাগ নিতে পারে না। অশিক্ষা, অজ্ঞতাও এর অন্যতম কারণ। সেজন্য গ্রাম ও শহরের মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার একটি প্রক্রিয়া এখন সর্বত্র চলেছে। বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনিস এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বনির্ভরতা প্রকল্পগুলি সফলভাবে কাজ করে চলেছে। এর ফলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে তা হল—

- পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনের মানোন্নয়ন,
- শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্তৃত হওয়া,
- উপার্জনশীল স্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিছুটা শ্রদ্ধা তৈরি হওয়া,
- কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য কিছুটা সমানাধিকার,
- স্বাধীনতাবোধ। পুরুষের ইচ্ছায় তার শয্যা সঙ্গিনী না হওয়া,
- শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া,
- বিনোদনের সুস্থ উপায়গুলি কাজে লাগানো,
- ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কিছুটা সঞ্চয় প্রবণতা, এবং
- অতি অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

২.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি বলতে বোঝায়, জনসংখ্যার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে। জনসংখ্যার যে উপাদানগুলি জনবিজ্ঞানে চর্চা করা হয় তার মধ্যে আছে, নারী-পুরুষের মোট সংখ্যা, নারী ও পুরুষের অনুপাত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার গঠন, অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যার

অনুপাত, জনঘনত্ব, বয়সভিত্তিক নারী ও পুরুষের আনুপাতিক গঠন। ভারতে মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ১০৪ কোটিরও বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। নানা কারণে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। একমাত্র কেরলে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে পুরুষের চেয়ে বেশি। অন্যত্র শুধুমাত্র কম নয়, বিপজ্জনক ভাবে কম। অশিক্ষা, কুসংস্কার. সামাজিক কুপ্রথা এর জন্য দায়ী। কন্যা ভ্রূণ হত্যা এখনও ব্যাপক।

জনসংখ্যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলির পরিবর্তন হলে জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। প্রজনন ক্ষমতা, প্রজনন সক্ষমতা, স্থূল জন্ম হার, বয়স বিশেষের প্রজনন হার ও মোট প্রজনন হার এইগুলি প্রজনন সংক্রান্ত উপাদান। প্রজনন সংক্রান্ত উপাদানগুলি নির্ভর করে আর্থ সামাজিক বিষয়ের উপর। শিক্ষা, আয়, পেশা, বিবাহের বয়স, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রজননকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা পরিবর্তনের আর একটি উপাদান, মরণশীলতা। মৃত্যুর নানা স্তর আছে, যেমন, ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু (মৃত সন্তানের জন্মদান, গর্ভস্রাব, এবং গর্ভপাত), সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু, শিশু মৃত্যু এবং স্বাভাবিক পরবর্তী সময়ের মৃত্যু। মরণশীলতার সূচকগুলি হল, স্থূল মৃত্যু হার, বয়সভিত্তিক মৃত্যুহার, বয়সভিত্তিক মরণশীলতার হার এবং জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের আর একটি সূচক স্থানান্তর গমন। জনবিজ্ঞানে তিন প্রকার স্থানান্তর গমনের কথা বলা হয়। যথা, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন, স্থানীয় চলাচল এবং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন। এই সব উপাদানগুলির পরিবর্তন হলে যেমন জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়, তেমনি আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ কারণে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়, যেমন, আঞ্চলিক বিকাশ, আবহাওয়া, পেশা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছাড়াও প্রধান ও প্রথম পদ্ধতি ছিল, পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচার, জন্মশাসনের নানা পদ্ধতি, শল্যচিকিৎসা, প্রভৃতি নানা উপায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সর্বাংশে কার্যকর করা হয়নি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় শিক্ষা ও মেয়েদের স্বনির্ভরতা। এছাড়াও প্রজননগত স্বাস্থ্য রক্ষা করা হলে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম হয়, তার মরণশীলতা কমে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৮ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়?

(খ) জনসংখ্যার আকৃতি কাকে বলে?

(গ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির তাৎপর্য কী?

(ঘ) জন ঘনত্ব কোন কোন অঞ্চলে বেশি?

(ঙ) ভারতে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা কম কেন?

(চ) প্রজনন ক্ষমতা কাকে বলে?

(ছ) প্রজনন সক্ষমতা কাকে বলে?

(জ) স্থূল প্রজনন হার কাকে বলে?

(ঝ) বিবাহের বয়স ও প্রজনন ক্ষমতার সম্পর্ক কী?

(ঞ) মরণশীলতা কাকে বলে?

(ট) ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু কথাটির অর্থ কী?

(ঠ) আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন কাকে বলে?

(ড) সিফিলিস কোন জীবাণুদ্বারা সংক্রামিত হয়?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) নারী ও পুরুষের অনুপাত উল্লেখ করে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

(গ) জনঘনত্বের পার্থক্য কেন হয়?

(ঘ) প্রজনন ক্ষমতা ও প্রজনন সক্ষমতার পার্থক্য কি? জনসংখ্যার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী?

(ঙ) প্রজনন ক্ষমতার সঙ্গে আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সম্পর্ক উল্লেখ করুন।

(চ) মরণশীলতা কাকে বলে? মৃত্যুহার কোন কোন সূচক দ্বারা মাপা হয়?

(ছ) স্থানান্তর গমন কেন হয়?

(জ) জনসংখ্যা পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

(ঝ) প্রজননগত স্বাস্থ্য কি? এর সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক কী?

(ঞ) শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি আলোচনা করুন।

(খ) জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান ও কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা বিশদ আলোচনা করুন।

(ঘ) প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে উল্লেখ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

গঠন (Structure)

৩.১ সূচনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ জীবনযাত্রার মান

৩.৩.১ সম্পদ

৩.৩.২ জীবন যাপনের স্তর

৩.৩.৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

৩.৩.৪ বিকাশের প্রক্রিয়া

৩.৪ স্বাস্থ্য ও অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ

৩.৪.১ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতি

৩.৪.২ স্বাস্থ্য

৩.৫ যৌনশিক্ষা

৩.৫.১ যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য

৩.৫.২ যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

৩.৫.৩ যৌনশিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি

৩.৬ কৈশোরের শিক্ষা

৩.৬.১ কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য

৩.৬.২ কৈশোরের শিক্ষার পাঠক্রম

৩.৭ পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা

৩.৮ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১ সূচনা (Introduction)

জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা দেখা গেছে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিপরীতক্রমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রিত হলে জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়।

বিশেষভাবে পরিবেশের উপর তার প্রভাব প্রায়ই নেতিবাচক হতে দেখা যায়, যা মানুষের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনে। সুতরাং এমন একটি বিকাশ প্রক্রিয়া দরকার যা আমাদের ও চারপাশের জীব পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করবে না। এই বিষয়টি মূলত পরিবেশ শিক্ষার (Environmental Education) অন্তর্গত। জনসংখ্যা শিক্ষায় সেজন্য এদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিই আলোচনা করা হবে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সুস্থ হলে সামাজিক জীবনও সুস্থ হবে। যা জীবনযাত্রার মানের অন্যতম উপাদান। কিন্তু পারস্পরিক সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি, যৌনজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে যৌনজীবন ভঙ্গুর হয়ে পরে। তবে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি আকস্মিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তারজন্য যৌবন শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কারণ কৈশোরেই শুরু হয়ে যায় যৌনতার বিকাশ। এই প্রসঙ্গগুলিই বর্তমান এককে আলোচিত হবে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারবেন।
- জনসংখ্যার সঙ্গে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।
- যৌন শিক্ষা, কৈশোরকালীন শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার ধারণা, উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)

প্রথম এককে জীবন যাত্রার মান সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। জীবনযাত্রার মান নির্ণয়কারী উপাদানগুলির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এককে জীবনযাত্রার মান ও জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির সম্পর্ক সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাকি চারটি উপাদান সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে জানা দরকার।

৩.৩.১ সম্পদ (Resource)

সম্পদ হিসাবে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল মানব সম্পদ। মানব সম্পদ যদি উৎপাদনের কাজে লাগে তখনই তা সম্পদ বলে গণ্য হয়। মানুষের মেধা অথবা শ্রম অথবা উভয়ের মিলিত প্রয়োগের ফলে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার বিনিময়ে ব্যক্তি তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিনোদন, স্বাস্থ্য পরিসেবা সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারে এবং অক্ষম অবস্থায় তার আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারে। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও এখানে ব্যক্তির ভূমিকা নগণ্য নয়। জন সংখ্যা

শিক্ষা প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের কাছে সম্পদ হিসাবে তাদের মূল্য সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করে। এর ফলে শৃংখলাপরায়ণ, পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ, মেধাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি হয় এবং শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস (Self acstualisation) বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে উপরোক্ত গুণগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটলে মানুষের সম্পদমূল্য কমে যায়। মেধাসম্পন্ন কিন্তু পরিশ্রম বিমুখ মানুষের সম্পদ মূল্য কম।

ধন (Capital) যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ এবং অধিকাংশ দেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন। কিন্তু ধনের বন্টন ব্যবস্থায় ও ধন উৎপাদনে নিযুক্ত হলে, তার সুফল অন্য মানুষরাও ভোগ করে। ধন অফুরন্ত নয়। সুতরাং যার যতটুকু ধনসম্পদ আছে তার সুষ্ঠ ব্যবহার জীনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে ধনের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই সচেতন করে তোলা যায়। যে শ্রমিক উপার্জনের অধিকাংশ নেশার কাজে ব্যয় করে, তার জীবন যাত্রার মান উন্নত হওয়া অসম্ভব। আবার সঞ্চিত অর্থ (Idle money) সম্পদ হিসাবে মূল্যহীন যদি তা বিনিয়োগ করা হয়। জনসংখ্যার সীমিত থাকলে বিনিয়োগের উপযোগী ধনসম্পদ সৃষ্টি করা যায় এবং তার সাহায্যে জীবন যাত্রার মান আরও উন্নত করা যায়।

সবচেয়ে বড় সচেতনতা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে। জীবাশ্মজাত তৈল (Fossil fuel) ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত, কয়লার ভাণ্ডারও একইভাবে প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। নির্বিকার বন ধ্বংস করে মানব সভ্যতা সংকটের মুখে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এক কথায় প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বিশ্ব উষ্ণায়ন, ওজোন স্তরের ক্ষয় প্রভৃতি বিপর্যয় ডেকে আনছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কথাটির অর্থ বোধহীন ভোগ নয়, এই কথাটি প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের জানা দরকার যাতে তারা এর প্রতিরোধ করতে পারে এবং নিজেদের জীবনচর্যায় তার প্রতিফলন দেখাতে পারে।

প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে যেয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঘটে চলেছে। বিগত তিন দশকে এর অগ্রগতি বিস্ময়কর গতিতে ঘটছে। কিন্তু প্রযুক্তির ফলে মানুষের জীবনে নানা সমস্যাও ডেকে আনছে। সমস্ত প্রযুক্তিই সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়। দৈনন্দিন বিনোদন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বত্র এমন সব প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটেছে যা অর্থ সম্পদের অপচয় যতটা করে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির সুফল ও কুফলগুলি বোঝা দরকার এবং প্রযুক্তির সঠিক নির্বাচন ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করা দরকার। এই বিষয়েও শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে ওঠা ভালো।

খাদ্যের প্রধান উৎস প্রাকৃতিক ও কৃষিজাত সম্পদ। খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক কারও অবিদিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুষ্টিমূল্যহীন ক্ষতিকর কিন্তু সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি সকলের প্রবল আকর্ষণ। এর ফলে ধন সম্পদের অপচয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও রোগ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অপরিমিত ব্যয় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। খাদ্যের অপচয় রোধ, সঠিক খাদ্য নির্বাচন, স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ এই সবই প্রকৃত উন্নত জীবনের লক্ষণ। এই প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা যায়।

৩.৩.২ জীবনযাপনের স্তর (Level of living) :

মাথাপিছু গড় জাতীয় উৎপাদনের বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি বা পরিবারের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পারিবারিক আয় কীভাবে কার জন্য কতটা ব্যয় করা হবে, অর্থাৎ মাথাপিছু পারিবারিক বরাদ্দ কীভাবে স্থির করা হবে তা সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটি নীতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক বরাদ্দের কথা বলা হয়। যেহেতু ছোট বড়

সকলের প্রয়োজন সমান নয়, সেহেতু বরাদ্দ হওয়া উচিত প্রয়োজন ভিত্তিক। কিন্তু এই বিষয়ে অনেক সময়ই বৈষম্য সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায়। অর্থাৎ প্রয়োজন বিচার করার ক্ষেত্রেই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় (যেমন, ছেলে ও মেয়ে, মা ও বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত ইত্যাদি)। এই জাতীয় বৈষম্য উন্নত জীবনযাত্রার পরিচায়ক নয়। অপর একটি নীতি হল সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি। সকলের জন্য সমান বরাদ্দের নীতিটিও ভ্রান্ত। সেজন্য দুই নীতির মিলিত প্রয়োগ উৎকৃষ্টতম পদ্ধতি। অর্থাৎ মূলত সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হলেও, প্রয়োজন দেখা দিলে তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করে সাময়িকভাবে প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা। এই অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই গড়ে তোলা দরকার।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান উন্নত জীবন যাত্রার তিন শরিক এবং জন সংখ্যার সঙ্গে বিপরীতমুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, সকলের জন্য যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান হয় এমন বাসস্থান সুস্থজীবন যাপনের জন্য প্রয়োন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে অনেক সময়ই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে আলো বাতাসহীন, ছোট পরিসরের বাসগৃহে অনেকে একসঙ্গে বসবাস করার অসংখ্য নজির আছে। শহরের বস্তি অঞ্চলে, অননুমোদিত স্থানে ঝুপড়ি জাতীয় বাসস্থানের অবস্থা আরও খারাপ। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রথমেই সকলেই চেষ্টা করে বাসস্থান একটু ভালো করতে। প্রায়ই দেখা যায় এই সব বাসস্থানে মা বাবা ও বহু সন্তান একসঙ্গে বসবাস করে। এর ফলে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কোনটারই সংস্থান করা যায় না। মৃত্যু ও জন্মের হারও এদের অনেক বেশি। স্কুল ছুট বা স্কুলে ভর্তি না হওয়ার প্রবণতা বেশি। একটু বড় হয়ে উপার্জনের চেষ্টা, অপরাধ প্রবণতা, অসামাজিক আচরণ, নেশা করার প্রবণতা খুব বেশি। এই বিষয়গুলি জনসংখ্যার পক্ষে বিপজ্জনক এবং তা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, জীবন যাপনের উন্নতি সাধন, সন্তানের শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা ও নজরদারি।

৩.৩.৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Socio-political system)

সমাজের কুপ্রথা (বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি) দূর না হলে কোন সমাজের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এই প্রথাগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে ক্রমশ সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা ভেদাভেদকে হাতিয়ার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও কুখ্যাতি অর্জন করছেন। ধর্মের ভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়গত ভেদ, ভাষার ভিত্তিতে ভেদাভেদ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হচ্ছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের ভারতীয় সমাজ এখন পশ্চাৎমুখী।

বিদ্যালয় স্তর থেকেই ভেদাভেদ সম্বন্ধে নেতিবাচক প্রতিন্যাস তৈরি না হলে, মানবিক মূল্যবোধ তৈরি না হলে এবং অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা দূর না হলে এই অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। ধর্মীয় আচরণ অপেক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধ, যা সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধেই শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণে সাহায্য করে, তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনসংখ্যা শিক্ষা এই ভেদাভেদহীন, কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী নাগরিক তৈরি করায় বিশেষ সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। কোন কোন সম্প্রদায় সন্তান ধারণের বিষয়টিকেও ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দুরূহ হয়ে উঠছে। জীবন যাত্রার মানও যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও উন্নত হচ্ছে না।

জীবনযাপনের দৈনন্দিন সূচি লক্ষ করলে দেখা যায় প্রত্যেক পরিবারেই কিছু নিয়মনীতি আছে। তাদের আহার, নিদ্রা, কাজ, বিনোদন, সামাজিকতা সবকিছুর মধ্যেই একধরনের শৃংখলা সজাগ থাকে। এই সব পরিবারে সময়ের

সদ্ব্যবহার, সম্পদের সদ্ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই জাতীয় জীবন শৈলী উন্নত জীবন যাপনের সূচক। এই সব পরিবারে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব, সমানাধিকারের মনোভাব, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকায় এদের পরিবারের আকৃতি সব সময়ই ছোট থাকে। বিপরীত ক্রমে বহু পরিবারের জীবনযাত্রা প্রণালী বিশৃংখলা। এদের জীবন যাত্রায় উপরোক্ত জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। পরস্পর সমন্বয় ও বোঝাপড়ার অভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, তিক্ত সম্পর্ক এই সব পরিবারের বৈশিষ্ট্য। সুস্থ জীবন শৈলীর শিক্ষা বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু করা দরকার। জনসংখ্যা শিক্ষার ভূমিকা এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য এর ফলে পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়।

৩.৩.৪ বিকাশের প্রক্রিয়া (Process of Development)

এখানে বিকাশের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বর্তমান উদার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, এককভাবে কোন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সচল রাখা কঠিন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটি সরাসরি আমাদের জীবনকে স্পর্শ না করলেও, এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বোঝার পক্ষে সহায়ক হয়। যেমন, অনেক সময় হয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দায়ী। পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার মত ক্ষুদ্র বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মত বৃহৎ বিষয়ের যোগাযোগ টানা কঠিন কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পর্ক সরাসরি। সেজন্য তার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা ভালো।

৩.৪ স্বাস্থ্য ও অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ (Health and Sustainable Development)

1972 সালে Stockholm Conference on Human Development এবং মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত International Conference on Population (1984) এ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রসঙ্গটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান পায়। The International Planned Parenthood Federation (IPPF) এবং International Union for Conservation of Natural Resource (IUCN) ও বিকাশের এই অভিমুখ বিশেষভাবে সমর্থন করে। 1987 সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী Mrs. Brundtland এর নেতৃত্বে The World Commission on Environment and Development-এ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

সাধারণভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জনবসতির বিস্তার ও নগরায়ণের ফলে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। অধিক খাদ্য সংস্থান করতে যেয়ে জীবকুল ধ্বংস হচ্ছে। কলকারখানা, গাড়ীর ধোঁয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্রীণহাউস গ্যাস ওজন স্তর ক্রমশ পাতলা করে দিচ্ছে, যা প্রকৃত পক্ষে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট সূচিত করছে। অথচ সভ্যতার বিকাশ স্তব্ধ করা অসম্ভব।

অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ (Sustainable development) কথাটির অর্থ বিকাশ প্রক্রিয়ার জন্য সেইসব কৌশল

ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যা বিকাশের গতিকে ব্যাহত না করেও আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে না। পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশবান্ধব বিকাশ প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করতে গেলে জনসংখ্যা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত নীতি (National resource policies) এবং জাতীয় বিকাশ নীতি (National Development Policies) ইত্যাদির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা দরকার। যে সব বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশ শিক্ষার পাঠে করা হবে। এখানে মূলনীতিগুলির উল্লেখ করে জনসংখ্যার সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হবে। সেইসঙ্গে জনশিক্ষার ভূমিকার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

৩.৪.১ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতি (**Principles of Sustainable development**)

অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রধান নীতিগুলি স্থির করা হয় পরিবেশ, মানুষের চাহিদা ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে একযোগে বিচার করে।

পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ (Identification of the environment damaging factors) সাধারণভাবে কোন্ কোন্ বিষয় পরিবেশ ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি চিহ্নিত করার পাশাপাশি অঞ্চল বিশেষের পরিস্থিতিও চিহ্নিত করা দরকার। বৃক্ষচ্ছেদন, অরণ্যবিনাশ সর্বত্র সমান নয়। কলকারখানার ধোঁয়া সর্বত্র সমানভাবে বাতাসকে দূষিত করে না। রাসায়নিক বর্জ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের গ্রামীণ সমাজে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্যদেশে দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অনেক বেশি জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তা নিচে দেওয়া হল।

— অরণ্য ধ্বংস ও বৃক্ষচ্ছেদন।

— বন্যা ও বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য ভূমিক্ষয়।

— রাসায়নিক ও অবিনশ্বর অজৈব বর্জ্য নিষ্কাষণ।

— কীটনাশক রাসায়নিক সার ও অরণ্য ধ্বসের ফলে খাদ্য শৃংখল (Food cycle) নষ্ট হয়ে জীবকুল ধ্বংস হওয়া।

— জল সম্পদ বিনষ্ট হওয়া।

— উষ্ণায়ন।

— বায়ুদূষণ।

— খাদ্য দূষণ।

— এসিড বৃষ্টি।

বিকাশের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা (Identification of damaging factors in specific developmental area)

সমস্ত রকম ক্ষতিকারক বিষয় সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কৃষির সঙ্গে যেমন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার যুক্ত তেমনি, নগরায়নের সঙ্গে যুক্ত গ্রীণ হাউস গ্যাসের উৎপাদন, বৃক্ষচ্ছেদন, বায়ু ও জল দূষণ, ইত্যাদি। নির্দিষ্টভাবে এইগুলি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরেই শুরু হয়েছে। এইভাবে চিহ্নিত করার ফলে সঠিক কৌশল উদ্ভাবন করা, প্রযুক্তির বিকাশ ও অন্যান্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যাবে। কিছু কিছু পদক্ষেপ

নেওয়া হলেও সংকট যে ঘনীভূত তার প্রমাণ বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global warming) ফলে পৃথিবীর জলবায়ু ও তাপমাত্রায় বিপুল পরিবর্তন এবং তার ফলে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন, অসময়ে ঘন ঘন অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে।

উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা (Adopting appropriate strategies) উপরোক্ত বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হলে, তার জন্য সঠিক কৌশল স্থির করে কার্যকর করা দরকার। দুই প্রকার কৌশলের কথা চিন্তা করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। প্রথমটি প্রতিরোধমূলক এবং দ্বিতীয় প্রকার কৌশল প্রতিকারমূলক।

প্রতিরোধমূলক কৌশল (Preventive strategies) এমন কৌশল গ্রহণ করা দরকার, যাতে তার ক্ষতি না হয়। যথাসম্ভব ক্ষতিকারক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রতিরোধমূলক কৌশলের মূল কথা। কয়েকটি উদাহরণ,

— রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার।

— জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার।

— অন্যান্য প্রযুক্তির পরিবর্তন (পেট্রোল চালিত যানের প্রযুক্তি এবং রেফ্রিজারেটার ও ফ্লুরোকার্বন ব্যবহার বন্ধ করার প্রযুক্তি এর উদাহরণ।

— বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা।

— জলাভূমি সংরক্ষণ

— আবাসন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিবেশ বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন।

— জল সম্পদ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ।

প্রতিকারমূলক কৌশল (Remedial strategies) এমন সব কৌশল গ্রহণ করা যার সাহায্যে যতটা সম্ভব পরিবেশের ক্ষতিপূরণ করে পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়। এরকম কয়েকটি উদাহরণ।

— নতুন বন সৃজন এবং সর্বত্র বৃক্ষরোপণ।

— মরু অঞ্চলে এবং বড় বড় শহরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ জলস্তর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা।

— জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক শক্তি থেকে তাপ উৎপাদন করা (যেমন, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুচালিত জেনারেটর ইত্যাদি।

— লুপ্ত প্রায় প্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া।

সর্বস্তরে জনসাধারণের অংশগ্রহণ (People's Participation at every stage) : শুধুমাত্র প্রচার ও জনমত গঠনের অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। আইনের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ যতটা রক্ষিত হয়, প্রকৃত কাজ সেভাবে হয় না। বিশেষত আইন সবসময়ই সঙ্কীর্ণ একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একমাত্র সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে। বিজ্ঞানীরা তার নেতৃত্ব দিতে পারেন। নীতিগতভাবে বিকাশের কোন প্রক্রিয়াই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কার্যকর হয় না। অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

জনসংখ্যা শিক্ষা এবং পরিবেশ শিক্ষার কার্যকারিতা ঠিক এই জায়গায়। জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র বিষয়বস্তু পাঠ ও সচেতনতা মূল্যবোধ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট

জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া দরকার। বৃক্ষরোপণ ও তার সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক বুঝলেই হবে না, বৃক্ষরোপণ করে তাকে বাচিয়ে রাখার কাজে অংশগ্রহণ করলে তবেই প্রকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রয়োগে প্রথম দিকে ফসল উৎপাদন কোথাও দ্বিগুণ কোথাও তিনগুণ হওয়ার ফলে, আবার জৈব সারের যুগে ফিরে যাওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মের কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। জনসংখ্যা শিক্ষা এই ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে পারে যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও কিছু কিছু পরিবেশ বান্ধব আচরণ আয়ত্ত করতে পারে, এবং অস্তিত্ব সহায়ক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

৩.৪.২ স্বাস্থ্য (Health)

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু আলোচনা জীবনযাপনের মান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এখানে সেজন্য দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে, তার একটি স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পর্ক এবং অপরটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্ক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছে, স্বাস্থ্য একটি সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি বা অবস্থা, শুধুমাত্র রোগব্যাধির অনুপস্থিতি নয় (Health is a state or feeling of complete wellbeing and not merely the absence of diseases or disorder)।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আলাদা কিছু নয় বরং পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অনেকে শারীরিক স্বাস্থ্যকে আলাদা করে দেখেন। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয়গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

জৈবিক তথা জেনেটিক গঠন (Biological vis-a-vis genetic constitution) নানা শারীরিক অবস্থা ব্যাধি স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা তৈরি করে থাকে। তার কিছু কিছু জন্মগতভাবে পিতা-মাতার সুপ্ত জিন (Recessive gene) বাহিত হয়ে সন্তানের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। থ্যালাসেমিয়া, গ্যালাক্টোসেমিয়া বা ফেনাইলকিটোনিউরিয়া (Thallcemia, Galactocimia, Phenyleketoneuria) এর উদাহরণ।

পরিবেশ (Environment) : প্রাক্‌জন্মকালীন অবস্থায় গর্ভাশয়ের পরিবেশ (যেমন, মাতার দৈনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নেশা, ক্ষতিকারক intoxication ইত্যাদি) এবং জন্ম পরিবর্তীকালে বাইরের পরিবেশ স্বাস্থ্যের গতি প্রকৃতি ও অবস্থা স্থির করে দেয়। যেমন, দূষিত পরিবেশের চেয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। জল, বায়ু ও খাদ্য এই তিনটি উপাদানের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনশৈলী (Style of living) : এর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের অভ্যাস, নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত যত্ন, পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতা ইত্যাদি।

আর্থসামাজিক অবস্থা (Socio-economic status) : শিক্ষা, পেশা, আয়, মাথাপিছু ব্যয়, বাসস্থানের অবস্থা ও পরিবেশ এই সব মিলিয়ে আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম। যতটা সচেতনতা আছে তা আর্থিক অনটনের জন্য গ্রাহ্য করার উপায় থাকে না। ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিসেবা (Comprehensive health services) : এর অর্থ চিকিৎসা, টীকাকরণ ও

অন্যান্য প্রতিরোধমূলক সুযোগ কতটা আছে, এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের Article 47 এ বলা হয়েছে।

The State shall regard the raising of the level of nutrition and standard of living of its people and the iomprovement of public health among its primary duties....

এছাড়াও অন্যত্র নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির চিকিৎসার সুযোগ তার নাগালের মধ্যে থাকা দরকার। না হলে স্বাস্থ্যহীনতার কোন প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। ভারতে এখনও বহু অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিসেবা সহজলভ্য নয়। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে 15-20 কিলোমিটার যাওয়ার ঘটনা কম নেই। আবার সমস্ত পরিসেবা সর্বত্র পাওয়া যায় না। ছোট হাসপাতাল থেকে বড় হাসপাতালে পাঠানোর ঘটনাও অবিরাম ঘটে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিসেবায় ব্যক্তি মালিকানা বিপুলভাবে যুক্ত হওয়ায় অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য পরিসেবা দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য আরও বেশি করে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

স্বাস্থ্যের মান (Quality of health)

স্বাস্থ্যের মান কয়েকটি বিশেষ সূচক দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে।

মৃত্যু বিষয়ক সূচক (Mortality indicator) : স্থূল মৃত্যু হার। জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা, শিশু মৃত্যুর হার, প্রসূতি মৃত্যুর হার, বিশেষ রোগে মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রোগ সম্ভাবনার সূচক (Morbidity rate) : এখানে দুটি সূচক ব্যবহার করা হয়, Incidence rate ও Prevalence rate. কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, এক বছরে) এই দুটি সূচক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

$$\text{Incidence rate} = \frac{\text{নতুন রোগাক্রান্তের সংখ্যা}}{\text{জনতার যে অংশের রোগটি হওয়ার মত পরিস্থিতি রয়েছে}}$$

$$\text{Prevalence rate} = \frac{\text{নতুন ও পুরানো রোগাক্রান্তের সংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

পুষ্টিজনিত সূচক (Nutritional indicator) : এর অন্তর্গত হল, জন্মকালীন ওজন, বয়সোচিত ওজন, বয়সোচিত উচ্চতা, উচ্চতা মাফিক ওজন, বাহুর পরিধি, ত্বকভাঁজ করে তার বেধ।

স্বাস্থ্য পরিসেবার সূচক (Health care indicator) : এই সূচক পরিমাপ করা হয় পাঁচটি বিষয়ে।

(১) ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত।

(২) ডাক্তার ও সেবিকার সংখ্যার অনুপাত।

(৩) শয্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত।

(৪) জনসংখ্যা ও হাসপাতালের অনুপাত।

(৫) জনসংখ্যা ও গ্রামীণ প্রসবকারিণীর অনুপাত।

সদ্ব্যবহারের হার (Utilisation rate) : এই সূচকটি পরিমাপ করা হয়।

(১) দুই বছরের নীচে কত শিশুর টীকাকরণ হয়েছে (তালিকাভুক্ত সংক্রমনের সংখ্যা)

(২) কত সংখ্যক মহিলা গর্ভকালীন পরিসেবা গ্রহণ করেছেন।

(৩) কত সংখ্যক মহিলার শিক্ষিত সেবিকার হাতে প্রসব করিয়েছেন।

(৪) শয্যা পিছু কতজন ভর্তি হয়েছেন।

(৫) হাসপাতালে গড় পরতা কতদিন এক একজন ভর্তি ছিলেন।

সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক (Social and mental health indicate)

(১) আত্মহত্যার হার।

(২) অপরাধের হার।

(৩) পথ দুর্ঘটনার হার।

আর্থ সামাজিক সূচক (Socio-economic indicator)

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

(২) মাথাপিছু GNP।

(৩) বেকারত্বের স্তর।

(৪) নির্ভরতার অনুপাত।

(৫) বয়স্ক শিক্ষিতের হার।

জীবনযাত্রার মানের সূচক (Quality of life indicator) : তিনটি বিষয় একত্রে যোগ করে The Physical Quality of Life Indiex (PQLI) নির্ণয় করা হয়, শিশু মৃত্যু, জীবনের প্রত্যাশা (কোন বয়সে) এবং ঐ বয়সে স্বারক্ষতার হার।

স্বাস্থ্যের উপরোক্ত সূচকগুলির মধ্যে সমস্ত প্রসঙ্গ জনসংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে জনসংখ্যা সীমিত থাকলে স্বাস্থ্যের সূচকগুলিও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হবে এবং উন্নততর স্বাস্থ্য সূচিত করবে। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশ অন্যতম। সুতরাং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কিত। শুধু তাই নয় যে সূচকগুলির কথা উল্লেখ করা হল তারমধ্যে কয়েকটি পরিবেশের গুণগত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এইজন্যই বলা হয় জনসংখ্যা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য এই তিনটি বিষয় জনসংখ্যা শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে যৌন শিক্ষা পরে যথাক্রমে কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হয়।

৩.৫ যৌন শিক্ষা (Sex Education)

শিক্ষা বিজ্ঞানে কৈশোর (Adolescence) এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা (Mental Hygiene) দীর্ঘকাল ধরেই অন্যতম প্রধান চর্চার বিষয়। ফলে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরেই বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষাকে পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার একটি সোচ্চার দাবি শিক্ষাবিদ্‌রা করে আসছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা খুবই প্রবল থাকায় তা কখনই কার্যকর করা হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে ব্যাপকভাবে AIDS সংক্রমণ, নেশা করার প্রবণতা, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি

বৃদ্ধি পাওয়ায় একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে বিষয়টির চর্চা শুরু হয়েছে। সে হিসাবে যৌন শিক্ষা নামটি পরিত্যক্ত হলেও তার বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত হয়েছে পারিবারিক জীবনের শিক্ষা (Family Life Education) বা কখনও জীবনশৈলীর শিক্ষা (Life style Education) নামক বিষয়ের মধ্যে। সেজন্য সংক্ষেপে যৌন শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার।

৩.৫.১ যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Sex Education)

যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুটা সীমাবদ্ধ :

যৌনাঙ্গ ও প্রজনন বিজ্ঞানের সাধারণ অথচ সঠিক তথ্য দান।

কৈশোরকালীন যৌন পরিবর্তনগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

যৌন জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা।

নারী ও পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনতার ভূমিকা।

সম্ভাব্য বিপদ ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা।

৩.৫.২ যৌন শিক্ষার পাঠক্রম (Curiculum of Sex Education)

সরাসরি স্বতন্ত্রবিষয় হিসাবে যৌন শিক্ষা কখনই স্কুল পাঠক্রমে অনুমোদন পায়নি। প্রধানত জীবন বিজ্ঞানের পাঠে যৌন ও আযৌন প্রজনন (Sexual and asexual reproduction) সম্পর্কিত অংশগুলির মাধ্যমে যৌন শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মানুষের যৌন জীবন অনেক জটিল ও তার সঙ্গে শুধুমাত্র শারীরিক নয় মানসিক বিষয়ও অনেকটা জড়িত, সেহেতু জীবন বিজ্ঞানের পাঠে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি।

২.৫.৩. যৌনশিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching Sex Education)

এই বিষয়টিও বিতর্কিত এবং বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু রক্ষণশীলতা বনাম আধুনিকতা। জীবন বিজ্ঞান পড়ানোর সময় মানুষের প্রজননের প্রসঙ্গটি তুলে ধরার প্রস্তাব অনেকেই প্রত্যাখান করেছেন। শিক্ষিকারা মেয়েদের এবং শিক্ষকরা ছেলেদের পড়াবেন কিনা এই বিতর্কও কম হয়নি। এমন কি এই বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা এই জাতীয় তুচ্ছ বিতর্কও অনেকে তুলেছেন। আশ্চর্য এই যে এই বিষয়টিকে এখনও কোন কোন ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক বিষয় করে তুলতে চাইছেন। শিক্ষকদের মতামতও দ্বিধাবিভক্ত। শুধু তাই নয় প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বার্থে বিষয়টি পরিচালিত করতে চেয়েছেন। যেমন, কোন কোন NGO যৌনশিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমকে কেবল মাত্র যৌনতাবাহিত রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা ও জন্মশাসন প্রণালী ব্যবহারের শিক্ষার হিসাবে পরিচালিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। পরবর্তী কালে যৌন শিক্ষার বদলে কৈশোরের শিক্ষা নামটি দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে এবং যৌন শিক্ষা শব্দটি বাতিল হয়ে যায়।

৩.৬ কৈশোরের শিক্ষা (Adolescent Education)

জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) এবং পরবর্তীকালে 1992 সালের Programme of Action থেকে প্রাপ্ত

সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষার পরিবর্তে কৈশোরের শিক্ষা (Adolescent Education) প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে কিছুটা ব্যাপক।

২.৬.১ কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Adolescent Education)

এই বিষয়টি যে উদ্দেশ্যে প্রচলন করার চেষ্টা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

- শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কৈশোরকালীন পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক এবং বড় হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।
- পরিবর্তনগুলির কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমস্ত বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করা।
- যৌনাঙ্গ ও প্রজনন বিষয়ে সঠিক তথ্য জানানো।
- সন্তান জন্মের বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেওয়া।
- কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা এবং সঠিক অভিযোজনে সাহায্য করা।
- যৌনতাবাহিত রোগগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ও তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করা।
- রোগগুলির প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান।
- ছেলেদের এবং মেয়েদের পরস্পর সমমর্যাদা দান ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা।

২.৬.২ পাঠক্রম (Curriculum)

1997-98 সালে NCERT কৈশোরের শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয়গুলি রচনা করার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগ অনুযায়ী রাজ্যস্তরে SCERTগুলিও আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ রচনার কাজ শুরু করেছিল। এই পাঠের দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশ জীবন বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পাঠক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রজনন বিজ্ঞান (Reproductive Biology) ও মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে পড়ানোর কথা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশটি সরাসরি স্বতন্ত্রভাবে যৌনতাবাহিত রোগ, তাদের কারণ, সংক্রামণের পদ্ধতি, রোগলক্ষণ, সম্ভাব্যবিপদ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য রচনা করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৈশোরের শিক্ষাও ব্যাপকভাবে প্রচলন করা যায়নি। এবং যেহেতু প্রচলন করা যায়নি, সেহেতু শিক্ষণ পদ্ধতির প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে যায়।

৩.৭ পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা (Family Life Education)

পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার সঙ্গে কৈশোরের শিক্ষার মৌলিক পার্থক্য সামান্যই। এই বিষয়টির সিংহভাগ জুড়ে আছে কৈশোরকালীন পরিবর্তনগুলির বিশদ পরিচিতি। বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে শৈশবকালনী যৌনতা (Infantile sexuality) এবং বাল্যকালীন যৌনতা (Childhood sexuality)। সেই সঙ্গে প্রজনন সম্বন্ধে সরাসরি শিক্ষাদান, শিশুর জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান এই সবকিছুই পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষায় স্থান পেয়েছে। যৌনতা বাহিত রোগ, নানা ধরনের নেশার দ্রব্য ও তার কুফল, যথেচ্ছ ঔষধ অকারণে ব্যবহারের কুফল ইত্যাদি বিষয়ে শেখানোর প্রয়াসও রয়েছে বিষয়বস্তুর মধ্যে। সামগ্রিকভাবে যা কিছু একজন কিশোর বা কিশোরীর পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য, ভবিষ্যৎ সুস্থ জীবনযাপনের জন্য জানা প্রয়োজন তার সব কিছুই আছে পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষায়।

কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির অতিরিক্ত যে সব উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে তা হল,

জীবন ও পরিবার সম্বন্ধে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে সচেতন করা।

অনৈতিক কাজ ও নেশা সম্বন্ধে আন্তরিক বিরাগ সৃষ্টি করা।

সহনশীলতা ও অভিযোজন।

উন্নত নৈতিকবোধ।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব।

নানা বাধা অতিক্রম করে এর জন্য স্বতন্ত্র পাঠ রচনা করা হয়েছে এবং তা কার্যকর করা হয়েছে। পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি।

৩.৮ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা (Health Education)

বিদ্যালয় স্তরে স্বাস্থ্যবিদ্যা পাঠের প্রচলন প্রায় শতাব্দীকাল ধরেই প্রচলিত। সে হিসাবে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা কোন অভিনব পরিকল্পনা নয়। তবে জনসংখ্যার পরিবর্তন, সামগ্রিক বিকাশ, ব্যাপক বাধ্যতামূলক টীকাকরণ ইত্যাদির ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে যদিও মৌলিক নীতিগুলি একই আছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই,

জলবাহিত, খাদ্যবাহিত ও বায়ুবাহিত সাধারণ রোগগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

ঐ সব রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধ পদ্ধতি।

পরিচ্ছন্নতাবোধ ও অভ্যাস।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পানীয় ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

নিজের, পরিবারের এবং সম্প্রদায়গতভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid)।

প্রাথমিক সুশ্রুষা।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যবিদ্যা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়।

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

জীবনযাপনের মান নির্ধারক উপাদানগুলির মধ্যে সম্পদ, জীবন যাপনের স্তর, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিটি এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত উপনির্ধারকগুলি কোন না কোন ভাবে জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেজন্য এইগুলির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত হয়। আংশিকভাবে বিপরীতটাও সত্যি।

অন্যদিকে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা বিকাশ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং পরিবেশও ধ্বংস হয় না। এই জন্য তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়, যথা, পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ, বিকাশের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ নীতিটি হল সর্বস্তরে জন সাধারণের অংশগ্রহণ। প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক এই দুই প্রকার কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের অংশগ্রহণ ব্যতীত অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্য জনসংখ্যার সঙ্গে এবং জীবনযাপনের মানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি উপাদান। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয় পাঁচটি, যথা, জৈবিক তথা জেনেটিক গঠন, পরিবেশ, জীবনশৈলী, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিসেবা। অপরপক্ষে স্বাস্থ্যের মান নির্ধারিত হয় অনেক প্রকার সূচকের সমন্বয়ে। যেমন, মৃত্যু বিষয়ক, রোগ সম্ভাবনার সূচক, পুষ্টিজনিত সূচক, স্বাস্থ্য পরিসেবার সূচক, সদ্ব্যবহারের হার, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক ও আর্থ সামাজিক সূচক।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য প্রথমে যৌন শিক্ষা পরে যথাক্রমে কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হলেও প্রথম দুটি কার্যকর হয়নি। কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতর পটভূমিকায় পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা সম্প্রতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সুস্থ যৌনজীবন ও পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং সেই সঙ্গে যৌনতা বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।

৩.১০ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) কখন একজন মানুষ সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়?

(খ) সঞ্চিত অর্থের সম্পদমূল্য কম কেন?

(গ) পারিবারিক বরাদ্দের প্রকৃষ্ট নীতি কী?

(ঘ) সামাজিক ভেদাভেদের সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্ক কী?

(ঙ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ কাকে বলে?

(চ) প্রতিরোধমূলক কৌশল কী?

(ছ) স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা কী?

(জ) আর্থ সামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্যের নির্ধারক কেন?

(ঝ) স্বাস্থ্যের পুষ্টিজনিত সূচকগুলি কী কী?

(ঞ) কৈশোরের শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(খ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের ধারণার উৎপত্তি ও অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন কেন? উদাহরণ দিন।

(ঘ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণ আবশ্যিক কেন?

(ঙ) স্বাস্থ্যের নির্ধারক হিসাবে পরিবেশ ও জেনটিক গঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(চ) স্বাস্থ্যের মান হিসাবে মৃত্যু বিষয়ক এবং রোগ সম্ভাবনার সূচকগুলি কী কী?

(ছ) যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি লিখুন। এর ব্যর্থতার কারণ কি?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জীবনযাত্রার মান নির্ধারক উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

(খ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতিগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(গ) স্বাস্থ্যের নির্ধারকগুলি কী কী? প্রত্যেকটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) স্বাস্থ্যের মান নির্ণয়ের সূচকগুলি উল্লেখ করুন।

(ঙ) যৌন শিক্ষা, কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন।

একক ৪ □ জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ (Population and Natural Resource)

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ সম্পদের প্রকারভেদ

৪.৩.১ অপূরণযোগ্য সম্পদ

৪.৩.২ পূরণযোগ্য সম্পদ

৪.৪ প্রতিকার

৪.৪.১ সম্পদের সংরক্ষণ

৪.৪.২ সম্পদের পুনর্ব্যবহার

৪.৫ সারসংক্ষেপ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ সূচনা (Introduction)

জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের সম্পর্কের ধারণা দিতে যেয়ে যে পাঁচ প্রকার সম্পদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম ও মৌলিক হল প্রাকৃতিক সম্পদ। সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে এসেছে। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আদিম মানুষকে সেই কারণেই যাযাবর জীবনযাপন করতে হয়েছে। এক স্থানের সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সংরক্ষণের তাগিদে সেখান থেকে সরে যেয়ে আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে ফিরে এসেছে তারা। কিছুকাল আগেও আন্দামানের ওঙ্গি নামক উপজাতিরা সারা বছরে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে তাদের বাসস্থান দ্বীপকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করত। কারণ তাদের কৃষিকাজ জানা ছিল না। সমুদ্রের মাছ শিকার আর বনজ সম্পদ সংগ্রহ এই ছিল তাদের বেঁচে থাকার উপায়। কিন্তু বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মত করে সচেতন ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদিম সংরক্ষণের রীতি ক্রমশ হারিয়ে গেছে। তাছাড়া অতিরিক্ত লোভ, আরাম বিলাস, অপরিমিত চাহিদার জন্য নির্বিচারে সম্পদ ধ্বংস করতে করতে তারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। সেজন্য প্রত্যেক মানুষেরই এখন জানা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা কী? তার জন্য কোন কোন বিপদ হতে পারে। সেইসঙ্গে জানা দরকার সম্পদের সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য উপায়গুলি কী কী। বর্তমান এককে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হবে। কিন্তু কোন পরিমাপ বা

পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। কারণ পরিসংখ্যাগুলির চেয়েও কার্যকর তথ্য বর্ণনা করে শুধুমাত্র বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আগ্রহীরা পরিসংখ্যানের জন্য সকলের শেষে দেওয়া গ্রন্থপঞ্জি থেকে নির্বাচিত বইগুলি দেখতে পারেন।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- সম্পদের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- পূরণযোগ্য ও অপূরণযোগ্য সম্পদের পার্থক্য বলতে পারবেন।
- সম্পদ ধ্বংসের কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিকার হিসাবে সম্পদের সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলি বলতে পারবেন।
- সম্পদের পুণর্ব্যবহারের পদ্ধতি বলতে পারবেন।

৪.৩ সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Resource)

যে সমস্ত উপাদান মানুষের চাহিদা ও সামাজিক লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সম্পদ এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং কোন বস্তুর সম্পদমূল্য নির্ভর করে তার ব্যবহার যোগ্যতার উপর। সহজ লভ্যতা ও প্রাচুর্য সম্পদের মূল্য কমায়। ইতিপূর্বে জীবনযাত্রার মান প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার সম্পদের কথা বলা হয়েছে, যথা, মানব সম্পদ, খাদ্য, ধন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তি। এর মধ্যে ধন বা অর্থনৈতিক সম্পদ মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট কৃত্রিম সম্পদ। সঠিক অর্থে সমস্ত সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিনাশ নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদেরই সম্পর্ক। সেজন্য এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টি। প্রাথমিক ভাবে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে সম্পদের একটি বৃহত্তর অংশ ব্যয়করা হয় শক্তি উৎপাদনের জন্য। এমন কি যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার প্রধান অংশই ব্যয়িত হয় শরীরে তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য। পুষ্টির উপাদানগুলি শরীরের প্রতিটি উপাঙ্গকে সবল রাখার জন্য শক্তি যোগায়। সম্পদ শক্তি উৎপাদন করায় ব্যয়িত হোক বা অন্য কাজে লাগুক সবসময়ই তার রূপান্তর ঘটে। অপরিবর্তিত অবস্থায় সম্পদ সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারে না। সেজন্য মানুষ নানাভাবে সম্পদের রূপান্তর ঘটায় কিন্তু কখনও নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ একটি চালের দানাও তৈরি করতে পারে না। অনেক চরম প্রকৃতিবাদী মনে করেন সূর্যই একমাত্র শক্তি যা সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং মানুষের কাজ সম্পদের রূপান্তর ঘটানো এবং সম্পদ ধ্বংস করা অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ উৎপাদন করা, কিন্তু সৃষ্টি করা নয়। চারিত্রিক বিশেষত্ব অনুযায়ী সম্পদকে অনেক রকমভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার সবকিছু প্রয়োজনীয় নয়।

যে সম্পদ একবার ব্যবহারের পর আর ব্যবহার করা যায় না তাকে বলা হয় অপূরণযোগ্য সম্পদ। যেমন, খনিজ সম্পদ। কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি সম্পদ উত্তম শক্তির উৎস কিন্তু তার ভাণ্ডার সীমিত এবং ক্ষয়িষ্ণু। অপরদিকে জল, বাতাস প্রভৃতি বার বার ব্যবহার করা যায় কারণ, নানাভাবে সেগুলি আবার ফিরে আসে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় না। এগুলি পূরণযোগ্য সম্পদ। পূরণযোগ্য সম্পদ (Renewable Resource) ও অপূরণযোগ্য সম্পদ (Nonrenewable resource) দুই-ই সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও একটি আর একটির পরিপূরক নয়।

৪.৩.১ অপূরণযোগ্য সম্পদ (Non renewable resource)

এখানে প্রধানভাবে খনিজ সম্পদের কথাই বলা প্রয়োজন। খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক ভাবেই ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে কিন্তু তার তার নতুন করে তৈরি হচ্ছে না। বা হবে না। সঞ্চিত অর্থ যেমন একদিন শেষ হয়ে যায় তেমনি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসছে। ধাতুগুলির মধ্যে তামা ও নিকেল প্রায় নিঃশেষিত। সেজন্য তামা ও নিকেলের ব্যবহার খুবই কমানো হয়েছে। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামও অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে। সেজন্য বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum) : পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে 50 কোটি টন ও 500 বিলিয়ন ঘন মিটার (আনুমানিক)। প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার আপাততত সন্তোষজনক হলেও পেট্রোলিয়ামের চাহিদা অনুযায়ী মজুতের পরিমাণ খুবই কম। সেজন্য পেট্রোলিয়াম আমদানির দরুণ আমাদের অর্থনীতির উপর সব সময়ই চাপ বজায় থাকে।

কয়লা (Coal) : জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে যত মজুত কয়লার ভাণ্ডার আছে তার অনেকটাই উত্তোলন করা যাবে না। সুতরাং সম্পদ হিসাবে তার মূল্য নেই। যে হারে বর্তমানে কয়লা উত্তোলন করা হয় তার দরুণ অদূর ভবিষ্যতে কয়লার সঙ্কট দেখা দেবে। কয়লার একটা বড় অংশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন হয়। কয়লার দূষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় গৃহস্থালীতে কয়লার ব্যবহার যথা সম্ভব কমানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু সকলের কাছে এখনও প্রাকৃতিক গ্যাস বা কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাস (Coal gas) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৪.৩.২. পূরণযোগ্য সম্পদ (Renwable Resource)

পূরণযোগ্য সম্পদের একটি বড় অংশ কৃষিজ ও বনজ সম্পদ। কিন্তু সমস্যা এই যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতি বৎসরই খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে কৃষি জমি উদ্ধার করে কৃষি জমি বাড়িয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তার তিনটি প্রকারভেদ আছে,

বন ধ্বংস করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা।

সেচের সাহায্যে পতিত অনুর্বর জমি উদ্ধার।

নদী, জলাভূমি ইত্যাদি ভরাট করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা।

এর মধ্যে দ্বিতীয়টি ছাড়া বাকি দুটি ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন বসতি স্থাপন, কলকারখানার প্রসার ও অন্যান্য কারণে কিছু কিছু কৃষিজমির রূপান্তর ঘটায় বনজ সম্পদের উপর আক্রমণ হয় সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও নানা কাজে কাঠের ব্যবহার, জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার বন ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ।

অরণ্য (Forest) : অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে শুধুমাত্র সম্পদের পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে কমে তাই নয় আরও কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

বন্যপ্রাণীর খাদ্য শৃংখল বিপর্যস্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বনের মধ্যস্থিত তৃণজাতীয় উদ্ভিদ তৃণভোজী (হরিণ ইত্যাদি) প্রাণীদের আহার যোগায় এবং অনেক প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে তৃণভূমি দখল করে নিলে অথবা ব্যবহারের জন্য অধিকাংশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ কেটে নিলে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়। এর ফলে বাঘ জাতীয় প্রাণিদের বিলোপ ঘটে। ভারতে বাঘের সংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ এটাই। মাঝে মাঝেই বন্য হাতির দল লোকালয়ে এসে ফসল খেয়ে যায় এবং বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যায় তার কারণ বসতি ও অরণ্যের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। যা একদিন হাতিদের বিচরণভূমি ছিল, সেগুলি কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়।

অরণ্যকে রক্ষা করে অরণ্যবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রয়োজন অনেকটাই মেটে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং অরণ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে অরণ্যজাত নানা দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণ বাড়তে পারে না। অতিরিক্ত চাপের জন্য একদিকে যেমন অরণ্যের চরিত্র নষ্ট হয় অন্যদিকে বনবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতে এর নজির অসংখ্য।

আবহাওয়ার পরিবর্তন অরণ্য সম্পদ নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। অনাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয়, বন্যা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে কৃষি সম্পদ ধ্বংস হয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে। অনাবৃষ্টি বা বন্যার ফলে শুধুমাত্র যে স্থানীয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ পূরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ কম বেশি হওয়ার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দামের ওঠা নামা। এক অঞ্চলের ফসল নষ্ট হলে সারা দেশে তার প্রভাব পড়ে।

অরণ্যের সংকোচন সহজ অধিগম্যতার ফলে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের স্বার্থে চোরাশিকার ও কাঠচুরি করে অরণ্যের আরও ক্ষতি সাধন করছে। এর ফলে প্রায় নিঃশব্দে অরণের গভীরে পরির্তন ঘটে চলেছে যার ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারি ও বহুমুখী।

কৃষি (Agriculture)

কৃষির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা একবার উল্লেখ করা হয়েছে। অরণ্য ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিজমি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কিছু কিছু সমস্যার কথা বলা প্রয়োজন।

1960-এর দশকে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল স্বামীনাথন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে। উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল বীজ তৈরি করে সেই সময় তাঁরা ভারতকে খাদ্য সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ঐসব ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল খুবই কম। ফসল রক্ষার জন্য নানা রাসায়নিক সারও কীটনাশকের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এর ফলে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের সঙ্গে উপকারী কীট পতঙ্গও একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেত। কীটনাশকের প্রভাবে পাখিদের মৃত্যু হতে থাকে প্রচুর সংখ্যায়, কারণ তাদের খাদ্য ছিল ঐসব কীটপতঙ্গ। তাছাড়াও কীটনাশক রাসায়নিকগুলির কঠিন শৃংখল এমনই যে সেগুলি কখনই রাসায়নিক

গুণ নষ্ট হয় না, অর্থাৎ অনুর গঠন কখনই ভাঙে না। এই সাব রাসায়নিক জলবাহিত হয়ে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে জমা হওয়ায় জলজ উদ্ভিদ ও মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। এই বিপর্যয়ের জন্য অন্য ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হতে হতে বহু পাখি, মাছ, জলজ প্রাণি এখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে।

অপরিকল্পিত চাষ, অর্থাৎ চাষীরা নিজেদের জমিতে পছন্দ মত ফসল চাষ করায় কখনও কখনও অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ফলন এবং অপ্রতুল প্রয়োজনীয় ফলন হওয়ার ফলে ফসলের সম্পদমূল্য যথাযথ হয় না, জনসংখ্যার সঙ্গে বিষয়টি এই কারণে যুক্ত যে বৃহৎ পরিবারের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই প্রধান। তাদের পক্ষে পরিকল্পনা করার চেয়েও বড় প্রশ্ন গত বছর কোন ফসলের বাজার দর কেমন ছিল বা কোনটা বেশি লাভজনক হতে পারে। ছোট পরিবারের আর্থিক সহনশীলতা বেশি হওয়ায় তারা অপেক্ষা করতে পারে।

সেচের সুযোগ সর্বত্র না থাকার জন্য কৃষিকাজের জল তোলা হয় ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে। শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের অনাবৃষ্টি বা কম বৃষ্টির সময় জলস্তর নেমে যায় অনেক নিচে। গ্রামের পুকুর, খাল, বিল শুকিয়ে যায় সহজেই। নলকূপে পানীয় জল পাওয়া যায় না। জল সম্পদের অভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে বিপুল সংখ্যক মানুষের।

জলস্তর নিচে নেমে যাওয়ার আর একটি ভয়াবহ পরিণতি মাটির থাকা আর্সেনিক যৌগের রাসায়নিক পরিবর্তন। পরিবর্তিত রাসায়নিক যৌগ জলে অদ্রবণীয় অবস্থা থেকে দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে জলের সঙ্গে মিশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে।

অরণ্য ও কৃষি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অনেক। তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। এখন কয়েকটি প্রতিকারের কথা বলা দরকার।

৪.৪ প্রতিকার (Remedies)

নীতিগতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস রোধ করার দুটি দিক আছে। একটি দিক প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও অপরটি পুনর্ব্যবহার। সংরক্ষণ কথাটিতে কোন সম্পদ ব্যবহার না করার একটি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ অর্থ সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করা নয়, নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও পুনরুৎপাদন করে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা। অন্যদিকে পুনর্ব্যবহার করার অর্থ কোন সম্পদ একবার ব্যবহার করা হয়ে গেলে তার যে রূপান্তর ঘটে, সেই রূপান্তরিত বস্তুকে অন্যভাবে ব্যবহার করা।

৪.৪.১. সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of Resources)

পরিকল্পিতভাবে সম্পদ যদি এমনভাবে বণ্টন করা যায় যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি ব্যবহার করা না হয় এবং যতটা সম্পদ ব্যয়িত হল তার পরিবর্তে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা হয় তবে তাকে বলা হয় **সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of Resource)**। এখানে সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হল। জনসংখ্যা শিক্ষায় বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরলে, তারা প্রথম থেকেই সংযত হতে শিখবে এবং সম্পদ সংরক্ষণে তৎপর হবে।

অরণ্য সম্পদ (Forest Resoure) : অরণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রধানতম পদক্ষেপ যতটুকু বনাঞ্চল আছে তাকে

আর কোনভাবেই সঙ্কুচিত হতে না দেওয়া। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র আইনের সাহায্যে অরণ্য সংরক্ষণ করা যাবে না, সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অন্যান্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার কয়েকটি নিম্নরূপ—

(১) কাঠের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বিকল্প বস্তুর ব্যবহার। বর্তমানে ঘরের দরজা জানালা, গ্রামে কাঠের খুঁটি, আসবাব পত্র এবং জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। জ্বালানির প্রসঙ্গটি তাপশক্তি প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হবে। শহরাঞ্চলে দরজা জানালায় লোহা, এলুমিনিয়াম, কাচ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। আসবাব পত্রের ক্ষেত্রেও, লোহা, মোল্ডেড প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহারে মানুষ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে কাঠের দরজা জানালা, আসবাব এখনও বহু মানুষের কাছে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক সেজন্য কাঠের ব্যবহার এখনও কম নয়। তাছাড়াও কাঠের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে যা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এটাও অন্যতম কারণ।

(২) যতটা অরণ্যের ক্ষতি হয় তার জন্য নতুন অরণ্য সৃজন করা দরকার। বনে স্বাভাবিক নিয়মে অনেক গাছের মৃত্যু ঘটে। কিছু কিছু গাছ কেটে নেওয়ার দরকার হয়। তার পরিবর্তে নতুন চারাগাছ রোপণ করা এবং তাকে বাড়িয়ে রাখা দরকার। এর পাশাপাশি সামাজিক বনসৃজন (**Social Forestry**), নাগরিক ও দৃষ্টি নন্দন বনসৃজন (Urban and landscape forestry), ঔষধি ও অর্থনৈতিক বনসৃজন (Medicinal and Economic forestry) ইত্যাদির মাধ্যমে অরণ্য সম্পদ রক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। সামাজিক বনসৃজন কথাটির অর্থ লোকালয়ে, চাষের জমির ফাঁকে ফাঁকে। পতিত জমিতে যেখানে সম্ভব সেখানেই গাছ লাগিয়ে বড় করে তোলা। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণের চেয়েও তাকে লালন পালন করায় অবহেলা বেশি। নাগরিক ও দৃষ্টিনন্দন বনসৃজন করে শহরের পথ, পার্ক, প্রতিষ্ঠান এগুলিকে সাজিয়ে তোলা যায়। এর ফলে একদিকে পরিবেশ রক্ষা পায়, শহরের ধূলো ধোঁয়ার হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায় আবার সৌন্দর্য বৃদ্ধিও হয়, যা মানুষের আনন্দের কারণ। ঔষধের গাছ, ফলের গাছ, রবার বা অনুরূপ যে সমস্ত গাছ থেকে সরাসরি অর্থ উপার্জন করা যায় সেই সব গাছ এখন নানা জায়গায় লালন করা হয়। তাছাড়াও নতুন চারা তৈরি, বৃক্ষ রোপণ, তার রক্ষণাবেক্ষণ এই সব কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে স্থানীয় মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নত করতে পারবে।

(৩) বনচর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা অবলম্বন করা দরকার। তাদের স্বাভাবিক বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র না পেয়ে অরণ্য নির্ভর জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব। কোন কোন জায়গায় (আসামের মানস অরণ্যে) দেখা গেছে যারা অন্যকোন জীবিকা না থাকায় চোরাশিকারি ও কাঠচোরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করছিল সেই সব মানুষ এখন অরণ্যরক্ষী হিসাবে সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হয়েছে। এতে সরকারের ব্যয় কম কিন্তু অরণ্য সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

কৃষি সম্পদ (**Agricultural Resource**) : কৃষি সম্পদ পূরণযোগ্য (Renewable)। কৃষির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রথমেই দরকার দেশের সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমিকে চাষের কাজে ব্যবহার করা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ আবশ্যিক।

(১) জমির প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। অনেক জমিতেই ফসলের পরিবর্তন করে আরও বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য মাটি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য।

(২) পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসল (Rotational Cultivation) চাষ করলে মাটির উর্বরতা ও ফসলের চাহিদা

ও মূল্যমান বজায় থাকতে পারে। তার জন্য কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ দরকার এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ করা দরকার। অন্যভাবে একেই বলা হয়েছে পরিকল্পিত চাষ। কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেকেই এই সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।

(৩) যথা সম্ভব জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। মাথাপিছু যে পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তার সঠিক রূপান্তর ঘটিয়ে (Waste management) সার হিসাবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত করা দরকার। এর ফলে দুই দিক থেকেই লাভ, জঞ্জাল থেকে মুক্তি ও উন্নত মানের ফসল। সারা বিশ্বে জৈবসার থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত জৈব সার প্রয়োগ করে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেশি হওয়ায় তা সকলের আয়ত্বের মধ্যে নেই।

(৪) জৈব প্রযুক্তি (Bio-technology) যার অন্যতম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, টিসু কালচার, ক্লোনিং (Genetic engineering, Tissue Culture, Cloning) ইত্যাদি নতুন ধরনের বীজ ও ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম। জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব, একই ফসলের মধ্যে একাধিক খাদ্যগুণ সঞ্চার করা সম্ভব এবং খাদ্য বৃদ্ধি করাও সম্ভব। এর ফলে কীটনাশকের প্রয়োজন কমবে এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। তবে জৈব প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। তার সব ভালোমন্দ এখনও জানা যায়নি।

(৫) কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ (Processing), বিপণন এবং বন্টনের ক্ষেত্রে কৃষক বান্ধব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। না হলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

(৬) সর্বত্র ভূমি সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। এর ফলে কৃষকের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

শক্তি (Energy) : প্রাকৃতিক সম্পদের একটি বড় অংশ শুধুমাত্র তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয়। আগুন জ্বালাতে শেখার পর মানব সভ্যতার দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তাপের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর বা অগ্রসরমান দেশগুলিতে অনেক তাপশক্তি কম খরচ হয়। তবে জনসংখ্যার দরুণ মোট তাপশক্তির চাহিদা এইসব দেশেও বিপুল। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কাঠ, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম মিলিতভাবে দীর্ঘকাল তাপশক্তির মূল উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে জলবিদ্যুৎ অনেকটা স্থান দখল করেছে।

কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও বয়লার ইত্যাদিতে কয়লার ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কিন্তু কয়লার বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ অনেক। এর ফলে বায়ু জল, মাটি সবই দূষিত হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চিমনি নিসৃত উড়ন্ত ছাই (Fly ash) একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দূষণের উপাদান। কাঠ অরণ্য ধ্বংসের কারণ, পেট্রোলিয়াম বায়ুদূষণের প্রধান কারণ। এই অবস্থায় যে সমস্ত প্রতিকার সম্ভব তার মধ্যে প্রধানতম হল বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান। কয়লা ইত্যাদি অপূরণযোগ্য শক্তির স্থানে পূরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারই একমাত্র বিকল্প।

(১) জৈব ডিজেল (Bio diesel) : Jatrofa জাতীয় উদ্ভিদ নিসৃত তেল পরিশ্রুত করে ডিজেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করার পরীক্ষা এখন সফল। পরিত্যক্ত জমিতে বা সামাজিক বনসৃজনের মধ্যে Jatrofa চাষ করা খুবই সহজ। এর ফলে অনেক কম খরচে বিকল্প জ্বালানি তেলের ব্যবহার পরিবেশ দূষণ ও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। চাষিও উপকৃত হবে।

(২) হাইড্রোজেন (Hydrogen) : হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস। জল থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস আলাদা করে নিয়ে তাকে জ্বালানি হিসাবে গাড়ি চালানের জন্য ব্যবহার করার পরীক্ষাও সফল। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন শুধু ব্যাপক হারে এর প্রয়োগের অপেক্ষা।

(৩) সৌর শক্তি (Solar energy) : সূর্য অসীম শক্তির আধার। আমাদের দেশ বছরের অধিকাংশ সময় অকৃপণ ভাবে সূর্যের আলো পেয়ে থাকে। সেজন্য বহুদিন ধরেই সৌর শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়ে আসছে। Solar cookes, Solar Heater, Solar Torch ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে যা সৌর শক্তিতে কাজ করে এবং বর্তমানে সহজলভ্য। এছাড়াও সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য Photovoltaic technology ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষভাবে নির্মিত সিলিকন কোশ সরাসরি সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। অনেকগুলি কোষের প্যানেল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার সাহায্যে একটি গোটা গ্রামের আলো, পাখা, টেলিভিশন চলতে পারে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে এইভাবেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। অপ্রচলিত শক্তির (Non Conventional energy) এই ব্যবহার আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করা দরকার। তবে প্রাথমিক ভাবে এর খরচ বেশি হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই শক্তির ব্যবহার সম্ভব নয়, সরকারি আনুকুল্যেই সম্ভব।

(৪) জলবিদ্যুৎ (Hydro electricity) : আমাদের দেশে সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এই তিনটি উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকে অনেকগুলি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্জাবের ভাক্‌রা-নাঙ্গালে, বিহার পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা, উড়িষ্যার হিরাকুঁদ নদীতে, গাড়োয়ালে টিহরি বাঁধ, সম্প্রতি গুজরাটে সর্দার সরোবর নামক নর্মদা নদীর বাঁধ এই রকম অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব বাঁধ যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সমৃদ্ধি আনতে পেরেছে তেমনি নানা বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অরণ্য ধ্বংস, কৃত্রিম বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ বাঁধগুলি। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এর ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। সেজন্য জল বিদ্যুতের পরিবর্তে অনেক কমখরচে পরিবেশ বান্ধব শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।

এরকম কয়েকটি পদ্ধতি,

(১) সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদন।

(২) সমুদ্রবায়ু থেকে শক্তি উৎপাদন।

(৩) গবাদি পশুর শারীরিক বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৪) পরিত্যক্ত ধাতু, প্লাস্টিক ও অন্যান্য অবিনশ্বর বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

এই সব উৎসগুলির এক একটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে তাদের ক্ষমতা কম। কিন্তু এদের একত্রিত শক্তি বিপুল। মনে রাখতে হবে ভারতের তিনদিকে সমুদ্র, অবাদি পশুর সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক এবং বিপুল জনসংখ্যার বর্জ্য অপরিমেয়।

৪.৪.২. সম্পদের পুনর্ব্যবহার (Recycling of resources)

ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত সম্পদ ভিন্নভাবে আবার ব্যবহার করার নাম পুনর্ব্যবহার। এক দিক থেকে দেখতে গেলে, জল ও বায়ু থেকে শক্তি উৎপাদন করাও পুনর্ব্যবহারে কেননা এর ফলে জল বা বায়ুর স্বাভাবিক ব্যবহার ব্যাহত হয় না।

পরিত্যক্ত ধাতু ও অবিনশ্বর (Nondegradeble) বর্জ্যকে শক্তিকে রূপান্তরিত করার পুনর্ব্যবহারের নজির। আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উড়ন্ত ছাই থেকে ইট তৈরি করার প্রচেষ্টাও একটি পুনর্ব্যবহারের উদাহরণ।

ছোট বড় অনেক ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের যে সম্ভাবনা আছে তা খুঁজে দেখা দরকার এবং কাজে লাগানো দরকার। দরিদ্র মানুষ পুনর্ব্যবহারে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। যেমন, পোড়া কয়লাকে আবার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার প্রথা অনেক অঞ্চলেই দেখা যায়। গৃহপালিত পশুপাখির বর্জ্যকেও তারা কাজে লাগাতে অভ্যস্ত। গাছের ঝরে পড়া পাতা অন্যতম প্রধান জ্বালানি। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে ঐ সব বস্তুর আরও পরিবেশ বান্ধব কিন্তু মূলবান ব্যবহার সম্ভব। যেমন, গাছের পাতা না পুড়িয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা।

সেজন্য শুধুমাত্র নতুন প্রযুক্তি নয়, গ্রামীণ জীবনের প্রথা, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, উৎসব এগুলির মধ্যে যে সব দীর্ঘকাল প্রচলিত সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি লুকিয়ে আছে সেগুলিও চিহ্নিত করা দরকার। তাহলে অনেক সহজে জনসাধারণকে সমস্ত উদ্যোগে সামিল করা যাবে।

৪.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

মানুষের আকাঙ্খা ও জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যবহৃত হয় তাকেই বলা হয় সম্পদ। সম্পদ নানারকম ভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। তার মধ্যে জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে পূরণযোগ্য এবং অপূরণযোগ্য এই দুই প্রকার শ্রেণি বিভাগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পদের একটি বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হয় শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নানাভাবে সম্পদের রূপান্তর করা প্রয়োজন হয়। যে সম্পদ একবার ব্যবহার করা হলে আর ব্যবহার করা যায় তাকে বলে অপূরণযোগ্য সম্পদ এবং যে সম্পদ বারবার ব্যবহার করা যায় অথবা আবার তৈরি করা যায় তাকে বলা হয় পূরণযোগ্য সম্পদ। কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানি অপূরণযোগ্য সম্পদ। কৃষিজাত দ্রব্য, অরণ্য সম্পদ পূরণযোগ্য।

অপূরণযোগ্য সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনিজ ধাতু ও অন্যান্য বস্তু কোনটিই অফুরন্ত নয়। সেজন্য এদের সীমিত ব্যবহার ও বিকল্প সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু এসম্বন্ধে সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। জনসংখ্যা শিক্ষাই এই দায়িত্ব নিতে পারে।

পূরণযোগ্য সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অরণ্য সম্পদ। অরণ্য ধ্বংস করে কৃষি ও বসত জমিতে রূপান্তরিত করে জীবকুলের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং বিশ্বউষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষির ক্ষেত্রেও খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও কীটনাশক প্রয়োগ কৃষিজমির ক্ষতি করেছে বিপুলভাবে।

পূরণযোগ্য সম্পদের ক্ষতিরোধ করার জন্য প্রতিকার হিসাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অরণ্য ও কৃষিজমির সংরক্ষণ, জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব সার ব্যবহার, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি পূরণযোগ্য সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শক্তির ক্ষেত্রে জৈব ডিজেল, সৌরশক্তি, বায়ু ও সমুদ্র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অপূরণযোগ্য সম্পদের কিছুটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও সম্পদের পুনর্ব্যবহার আর একটি বিকল্প পদ্ধতি।

৪.৬ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answers Questions)

(ক) সম্পদ কাকে বলে?

(খ) অপূরণযোগ্য সম্পদ কাকে বলে?

(গ) অরণ্যকে পূরণযোগ্য সম্পদ বলা হয় কেন?

(ঘ) জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফল কী?

(ঙ) কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্প কী?

(চ) জনসংখ্যার সঙ্গে পূরণযোগ্য সম্পদের সম্পর্ক কী?

(ছ) জৈব ডিজেল কাকে বলে?

(জ) বায়ুশক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়?

(ঝ) সামাজিক বনসৃজন কথাটির অর্থ কী?

(ঞ) বিনোদনমূলক বনসৃজন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সম্পর্ক কী?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) পেট্রোলিয়ামের সঞ্চিত ভাণ্ডার বর্তমানে কী অবস্থায় আছে?

(খ) অপূরণযোগ্য সম্পদের মধ্যে কয়লা ও ধাতুগুলির সঞ্চয় কেন কমে আসছে?

(গ) অরণ্য ধ্বংসের কারণগুলি কী কী?

(ঘ) কৃষিজ সম্পদ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

(ঙ) জৈব প্রযুক্তি কীভাবে কৃষি সমস্যাকে দূর করতে পারে?

(চ) সৌর শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়?

(ছ) জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কী কী?

(জ) পরিকল্পিত চাষ কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) ভূগর্ভস্থ জলস্তর কীভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে? তার ফল কী?

(ঞ) সম্পদের পুনর্ব্যবহার কাকে বলে?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করুন। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। সম্পদ ধ্বংসের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী?

(গ) পূরণযোগ্য ও অপূরণযোগ্য সম্পদের সংরক্ষণ কতরকম ভাবে করা সম্ভব? প্রতিকারের পন্থাগুলি উদাহরণসহ সবিস্তারে আলোচনা করুন।

একক ৫ ☐ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা ও পাঠক্রম (Agencies of and Curriculum in Population Education)

গঠন (Structure)

৫.১ সূচনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা

৫.৩.১ প্রথাগত শিক্ষা

৫.৩.২ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

৫.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম

৫.৪.১ পাঠক্রমের সমন্বয়

৫.৪.২ পাঠক্রমের সহগামিতা

৫.৫ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

৫.৬ পরিকল্পিত পাঠ

৫.৬.১ কয়েকটি সম্ভাব্য শিক্ষণ পদ্ধতি

৫.৭ সারসংক্ষেপ

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী চারটি এককে জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় স্তর থেকে জনসংখ্যার সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় পাঠক্রমে জনসংখ্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে যে প্রশ্নগুলি প্রথমেই উঠে আসে তার মধ্যে আছে, বিষয়টি কোথায় কোন স্তরে পড়ানো হবে, পাঠক্রমে জনশিক্ষার বিষয়টি কোথায় স্থান পাবে, পাঠ পদ্ধতিই বা কি হবে। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বর্তমান এককটির অবতারণা। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রধানত সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেয় এবং যা আবশ্যিকভাবে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরই পাঠ্য। দুটি বা তিনটি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ইত্যাদির

কোনটিকে লঘু করা যাবে না। আবার নতুন নতুন বিষয়ের ভার শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিলে তাদের পক্ষে তা দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা পাঠক্রম, পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এখানে তুলে ধরা হল।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থাগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠক্রমের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ অনুধাবন করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ভূমিকা অলোচনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে পারবেন।

৫.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Population Education)

যে কোন সংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা একক বা ব্যক্তিগতভাবে কার্যকর হতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বহুব্যক্তির কাছে শিক্ষাকে পৌছে দিতে পারে তাকেই বলা হয় শিক্ষার সংস্থা। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষার স্বীকৃত সংস্থা। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও নানা ধরনের সংস্থা থাকতে পারে। এমনকি কোন ধর্মীয় মঠ বা মিশন যদি বিশেষ কোন মতবাদ, বাণী বা মূল্যবোধ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালায়, তাকেও এক ধরনের সংস্থা বলা যায়। এই সব কারণে, যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education) এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা (Non formal Education) এই দুই প্রকার শিক্ষার আয়োজন দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার সংস্থাগুলিও সেইভাবেই দুই ভাবে বিভক্ত।

৫.৩.১ প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education)

এখানে প্রথমেই একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা হিসাবে এই দুই প্রকার শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

যখন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সক্রিয় শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীকে একযোগে শিক্ষা দান করা হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রথাগত শিক্ষা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় প্রথাগত সংস্থা (Formal agency of education)। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই সবই প্রথাগত প্রতিষ্ঠান। তাদের শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা কারণ,

- নির্দিষ্ট সময়সীমায় এক একটি পাঠক্রম শেষ করতে হয়।
- পাঠক্রম শেষ করার পর একযোগে সকলের মূল্যায়ন করে পরবর্তী পাঠক্রমে অংশগ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
- বিশেষ বিশেষ শিক্ষক এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ম অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ, শেষ করা এবং পরীক্ষা দিতে হয়।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে।
- আর্থিক ও বিদ্যাচর্চার জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা করা হয়।

এক কথায় সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বাঁধা নিয়মে বছরের পর বছর তার লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে যায়। জনসংখ্যা শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থাকা সম্ভব নয়। সেজন্য যে সমস্ত প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তারাই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে। জনসংখ্যা বিশারদ বা সকলেই সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। কারণ তারা মনে করেন বিদ্যালয় স্তর থেকেই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রস্তুতি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন স্তর থেকে শুরু করা যাবে সেই বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে।

প্রাথমিক স্তর (Primary Stage) : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স 6 থেকে 11 বৎসর অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এই স্তরের পাঠক্রমে মাতৃভাষা, একটি বিদেশি ভাষা, পাটীগণিত, প্রকৃতি পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়ানো হয়ে থাকে। মুল উদ্দেশ্য পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে যে দক্ষতাগুলি অর্জন করা দরকার তার প্রস্তুতি ও বিকাশ। আর সেই সঙ্গে তার চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জানা নিজের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা ইত্যাদি। জনসংখ্যা ও তার সমস্যা প্রাথমিক স্তরে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে শিশুদের কৌতুহল এবং সেই কৌতুহল চরিতার্থ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতা বোধ গড়ে ওঠে তাকে পরবর্তীকালে পরিবেশ সচেতনতায় অনায়াসেই রূপান্তরিত করা যায়। গ্রামের শিশুদের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে নিবিড় পরিচয়, শহরের শিশুদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সেজন্য প্রত্যেকেরই উচিত শহরের বাইরে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়া। যা পরবর্তী কালে জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage) : মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণিতে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে জনসংখ্যা শিক্ষায় বিষয়টি শুরু করার সুবিধা সবচেয়ে বেশি। কৈশোরকালে মানুষের যুক্তিবোধ, উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা ক্রমশ পরিণত হতে থাকে। তাদের মধ্যে চারপাশের জগৎকে শুধুমাত্র আবেগের বশে নয়, যুক্তিবুদ্ধি ও

তথ্য দিয়ে বুঝে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাদের সংবেদনশীলতায় অনেক আপাত তুচ্ছ বিষয়কেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সেজন্য জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে পারিবারিক জীবনের শিক্ষা শুরু করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

তাছাড়াও কিশোর বয়সে দৈহিক পরিবর্তন, বিশেষত যৌন গ্রন্থিগুলির সক্রিয়তা ছেলেমেয়েদের যৌন সচেতন করে তোলে এবং তারা নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এই পর্যায়ে পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে। পুরুষ ও নারীর সাম্য, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ তা এই সময় সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সমাজে নারীর স্থান পুরুষের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ভোগের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ভারতীয় সমাজে শুধু এই একটি কারণেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আজও মেটেনি। এই কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই জনসংখ্যা শিক্ষার উৎকৃষ্টতম সংস্থা। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির চর্চা শুরু হলে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব কিন্তু নতন করে শুরু করায় অনেক বাধা আছে।

৫.৩.২ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non formal Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুব কম নয়। আমাদের দেশে এখনও সমস্ত বালক-বালিকা প্রথাগত শিক্ষার আওতায় আসেনি। স্কুল ছুটের সংখ্যা এখনও উদ্বেগজনক ভাবে বেশি এবং আদৌ স্কুলে ভর্তি না হওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যাও অনেক। সেজন্য শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করলে জনসংখ্যা শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর জনসংখ্যা শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে না পারলে তার উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। সম্ভাব্য কয়েকটি প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হল।

মুক্ত বিদ্যালয় (Open School) : জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School) অথবা রাজ্যস্তরে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাদের পাঠকেন্দ্র সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে। তাদের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। তবে ঐসব বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ প্রথা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বলা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। কারণ মুক্তবিদ্যালয়েও নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে পড়া, পরীক্ষা দেওয়া, আমন্ত্রিত শিক্ষকের কাছে থেকে পরামর্শ নেওয়া এই সব বিষয়গুলি আছে। পাঠ শেষে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে হয় এবং পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে পড়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

পাঠকেন্দ্র কাছাকাছি না থাকলে, মুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু ডাক যোগে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেদিক থেকে মুক্ত বিদ্যালয় ও দুরশিক্ষা (Distance Education) ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (Adult Education Centre) যারা আর কখনই বিদ্যালয়ে যাবে না, তাদের স্বাক্ষর করে তোলা ও কার্যকরী কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও জনসংখ্যা, তার নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সমস্যা, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে পারে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। তার জন্য পরিকল্পনা, সহজভাষায় তথ্য সংকলন এবং তার আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে শুধুমাত্র স্বারক্ষরতা কেন্দ্র হিসাবে না রেখে প্রকৃত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করলে সেগুলি জনসংখ্যা শিক্ষায় ভালো সংস্থা হতে পারে।

জনশিক্ষা বিভাগ (**Department of Mass Education**) : প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার এবং অনেক মিউনিসিপালিটিতে একটি করে জনশিক্ষা বিভাগ থাকে। এই বিভাগের কাজ প্রধানত স্বাস্থ্য, পানীয়, মহামারী (Epidemic), পুষ্টি, পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। প্রধানতম পদ্ধতি প্রচার অর্থাৎ পোস্টার, স্লাইড শো সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা ইত্যাদি। জনশিক্ষা দপ্তরের প্রচার পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা, জীবনযাপনের মান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সংরক্ষণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। জনশিক্ষা দপ্তর ও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উত্তম প্রথাবহির্ভূত সংস্থায় পরিণত হতে পারে।

গণমাধ্যম (**Mass media**) : সংবাদপত্র ও অন্যান্য মুদ্রিত মাধ্যম, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যম গুলি জনসাধারণের মধ্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের অধিকাংশই বিনোদন, ছিদ্রান্বেষণ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রচার ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা পালন করে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রেডিও ও টেলিভিশন কিছুটা দায়িত্ব পালনে সচেতন। কিন্তু জনসংখ্যা শিক্ষার সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা সেখানেও অনুপস্থিত। অথচ এইসব মাধ্যমের যথেষ্ট সুযোগ আছে বিনোদনের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়ার। স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি প্রায়ই সাধারণ মানুষের অনুপযোগী, অন্যান্য জনশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রায় অনুপস্থিত। গণমাধ্যমগুলির এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার সর্বাগ্রে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (**NGO**) : নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের দেশে সক্রিয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সংস্থাই জনসাধারণের মধ্যে জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এই সব সংস্থার প্রধানতম কাজ নানা সূত্র থেকে আর্থিক অনুদানে বলীয়ান হয়ে অধিকার রক্ষা, আইনের সাহায্যে সুযোগ সুবিধা আদায় করা, এবং সরকারের কাজকর্মের প্রহরী হিসাবে নজরদারি বজায় রাখা। অথচ এই সব প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনসংখ্যা শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় বিষয় প্রসারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এমনকি স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ছোট ছোট সংগঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার ভূমিকা সংস্থা হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। অবশ্যই তার জন্য একটি সমন্বয়কারী ও পরিকল্পনা রচনাকারী ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৫.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Population Education)

প্রথাগত শিক্ষার মধ্যেই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে এ বিষয়ে সকলেই একমত। তার কারণগুলি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। সংক্ষেপে কারণগুলি আর একবার তুলে ধরা দরকার।

- কিশোর বয়সে যুক্তিবুদ্ধি ও তথ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- তারা পরিবেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সচেতন হতে থাকে।
- তাদের সৌন্দর্যচেতনা ও ন্যায়, অন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ এই সময় সবচেয়ে বাড়ে।
- ছেলে মেয়েদের পরস্পরের প্রতি স্থায়ী প্রতিন্যাস (attitude) গঠনের এটাই প্রকৃষ্ট সময়।
- যৌন চেতনার বিকাশকে পরিশীলিত পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে তৈরি করার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

- যৌন জীবন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তাদের ভবিষ্যৎ বহু সমস্যার সম্ভাবনা গোড়াতেই দূর করতে পারবে।
- নিজেদের আচরণ সংযত করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি জীবনের জন্য তৈরি করার কাজ এখানেই শুরু হয়।

এই সব এবং আরও অনেক কারণে পারিবারিক জীবনযাপনের শিক্ষা ও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি সংহত পাঠ প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করাই বিধেয়। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই শিক্ষার পাঠক্রম কি হবে?

প্রথমেই বলা হয়েছে যে জনসংখ্যা শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। আবার পূর্ববর্তী চারটি এককে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি, তৎসহ কিছুটা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই উপাদান ও বয়সবস্তুকে কিভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হবে সেইটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দুটি মূলনীতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার একটি সমন্বয়সাধন (Integration) এবং অপরটি পাঠক্রমের সহগামিতা (Correlation of curriculum)। প্রথম আলোচ্য বিষয় সমন্বয় সাধন।

৫.৪.১ পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum)

সাধারণত বিদ্যচর্চার এক একটি ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি। এর সুবিধা যাই থাক অসুবিধার দিকটিও কম নয়। প্রথম সমস্যা, বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের কাছে সেই দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। এক একটি বিষয় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। দ্বিতীয় সমস্যা, অনেক বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলি অভিন্ন হওয়ায়, একই বিষয় বারবার পড়তে বা শিখতে যেয়ে এক ঘেয়েমি, বিভ্রান্তি এবং শ্রমের অপচয় ঘটে।

কিন্তু যদি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় থেকে নেওয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একত্রে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং শেখা যায়, তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলি দেখা যায় না। উপরন্তু শিখন আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum) এবং এর ফলে রচিত পাঠক্রমকে বলা হয় সমন্বিত পাঠক্রম (Integrated Curriculum)। উল্লেখযোগ্য এই যে, সমন্বিত পাঠক্রমের ধারণা নতুন কিছু নয়। John Dewey তার Laboratory School-এ সমন্বিত পাঠক্রমের সফল পরীক্ষা করেন।

জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করলে সবচেয়ে সহজে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এর ফলে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে।

- ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে না।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য মিলিয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা তারা গড়ে তুলতে পারবে।
- কোন স্বতন্ত্র মূল্যায়ন দরকার হবে না।
- শিক্ষকদের কাজ সহজ হবে। জনসংখ্যার উপাদানগুলি তাঁরা সহজেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

সমন্বয় সাধনের দুটি আদর্শ প্রক্রিয়া আছে। প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম মিলিতকরণ (Infusion Model) দ্বিতীয়টি আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন (Interdisupltinary Integration)

মিলিতকরণ (Infusion Model) : এক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি আলাদা ভাবে নির্বাচন করা হয়

না। যে পাঠক্রম ইতিমধ্যেই প্রচলিত আছে তার বিষয়বস্তু থেকে যে সমস্ত প্রসঙ্গগুলি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে তার মাধ্যমে জনশিক্ষার বিষয়টি যতটা সম্ভব তুলে ধরা হয়। যেমন, ভূগোল পাঠের সময়, জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্বন্ধে পড়ানোর সময় জনসংখ্যার সমস্যা তুলে ধরা, কিংবা ইতিহাসে সভ্যতার উত্থান পতনে জনসংখ্যার ভূমিকার কথা আলোচনা করা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিটি নিষ্ক্রিয় আদর্শ (Passive model)। এখানে জনসংখ্যা শিক্ষণ অনেকটা উপজাত ধারণা (Byproduct) হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায় এর ফলে কাজের কাজ হয় না।

আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন (Interdisciplinery Integration) : এইটি প্রকৃত সক্রিয় আদর্শ (Active model)। এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা শিক্ষার বাঞ্ছিত উপাদানগুলিকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়। তারপর ঐ উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপযুক্ত অংশে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয় যে মূল বিষয়টির পাঠে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করেও জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীদের জানা হয়ে যায়। যেমন, রসায়নের যে অংশে আকরিক থেকে লৌহ নিষ্কাশনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়, সেখানে লৌহ আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডার সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া যেতে পারে। অথবা কোন অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদনের বিষয়ের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিপণ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজের বিবর্তন, বিশেষভাবে পশুদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের (যেমন, শিম্পাঞ্জি) সঙ্গে মানুষের পরিবারের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে মূল বিষয়বস্তুর পাঠক্রম সম্বন্ধেও নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জনশিক্ষার পাঠক্রমের সমন্বয় ও সম্পর্ক অনেকটা নিম্নরূপ।

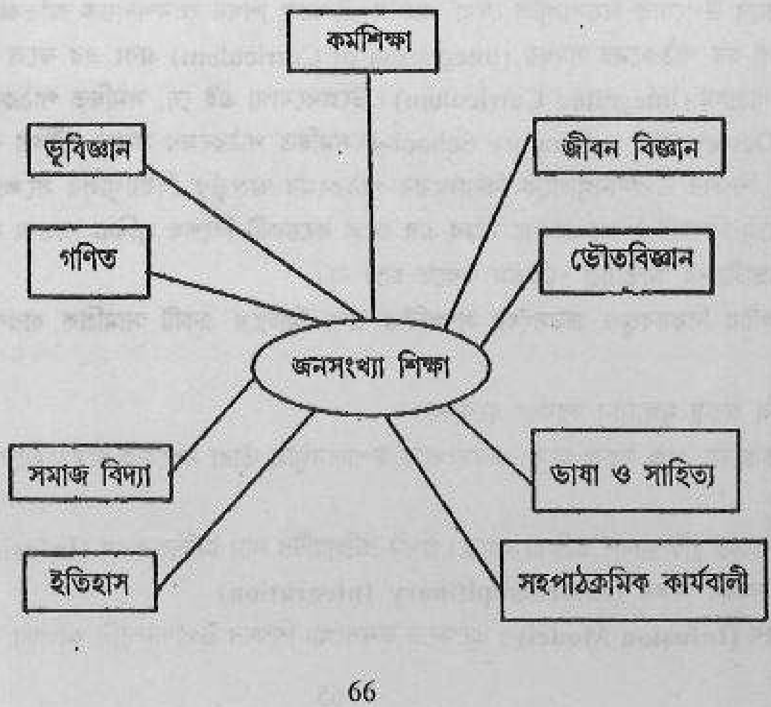

এই ধরনের সমন্বয় করার সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে জনসংখ্যা শিক্ষা কোন স্বতন্ত্র একটি বিদ্যাচর্চার শাখা নয়। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে উদ্ভূত জ্ঞান একত্রিত করে জনসংখ্যা শিক্ষা নামক বিষয়টি গড়ে উঠেছে। কোন বিষয়ের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার কোন কোন উপাদানের সমন্বয় করা হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম রচনার এবং জনসংখ্যার বিশেষজ্ঞদের উপর। কয়েকটি উদাহরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

বিষয়	জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদান	কোন অংশে দেওয়া হবে
ইতিহাস	সম্পদের আকর্ষণে মানুষের স্থানান্তর গমন	ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস
ভাষা ও সাহিত্য	অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা	রচনা, পত্ররচনা, সাহিত্যের পাঠ্যবইতে দুই একটি নির্বাচিত প্রবন্ধ।
ভূগোল	আঞ্চলিক আবহাওয়ার পরিবর্তন	জলবায়ু সংক্রান্ত পাঠ
জীবন বিজ্ঞান	প্রজনন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য	প্রজনন ও বংশবিস্তার সম্বন্ধে পাঠ
ভৌতবিজ্ঞান	দূষণ সংক্রান্ত তথ্য জ্বালানি হিসাবে হাইড্রোজেন ব্যবহার	কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রস্তুতি ও ধর্ম হাইড্রোজেনের প্রস্তুতি ও ধর্ম
সমাজবিদ্যা	মানবসমাজে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের ভূমিকা	একই বিষয়

৫.৪.২ পাঠক্রমের সহগমিতা (Correlation of Curriculum)

যখন অনেকগুলি সমান্তরল বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অপরের বিষয়বস্তুগত মিল কোন কোন অংশে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান তখন শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষণের সময় ঐ সাদৃশ্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে ধারণার ভিত্তিটি দৃঢ় করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পাঠক্রমের সহগামিতা। যেমন, ভূগোলের অক্ষাংশ দ্রাঘিমার ধারণা, গণিতের গ্রাফ সম্বন্ধে ধারণার সাদৃশ্য, ভৌতবিজ্ঞানে বিদ্যুৎ শক্তির বিভব পার্থক্য ও জলের চাপ সংক্রান্ত তথ্যের সাদৃশ্য ইত্যাদি।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহগামিতার প্রশ্নটি তখনই বিচার্য যখন এই বিষয়টিকে স্বতন্ত্র একটি পাঠ্য হিসাবে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথমেই এই প্রসঙ্গটি বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহগামিতার চেয়ে সমন্বয় সাধনের কার্যকারিতা অনেক বেশি।

৫.৫ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activities)

শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যে সমস্ত কার্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে কিন্তু সরাসরি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে বলা হয় সহপাঠক্রমিক কাজ। সহপাঠক্রমিক কাজ,

- মূল বিষয়ের শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করে।
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাকে দৃঢ় করে।
- শিক্ষার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা যোগায়।
- আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে সাহায্য করে।
- পারস্পরিক বোঝাপড়া, দলগত কাজে উৎসাহ দেয়।
- সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। এমন কি কখনও কখনও সহপাঠক্রমিক কাজই শিক্ষার প্রধান বাহন হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটি সহপাঠক্রমিক কাজের উদাহরণ, যা জনসংখ্যা শিক্ষার সহায়ক উল্লেখ করা হল।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion) : দলবদ্ধভাবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ ও শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সমন্বয় ঘটে। নদী, পর্বত, ঐতিহাসিক স্থান, অরণ্য, ভৌগোলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হতে পারে। জনসংখ্যা শিক্ষার উপযোগী শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচন নির্ভর করে কোন কোন উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে তার উপর। যেমন, কোন অরণ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে যেয়ে শিক্ষার্থীরা অরণ্য ধ্বংসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

প্রদর্শনী (Exhibition) : প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের উদ্যম, সংগঠনিক ক্ষমতা, পরিশ্রম ক্ষমতা ইত্যাদির পাশাপাশি শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ, বিজ্ঞান চেতনা, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হয়। নিজেদের উদ্যোগেই অনেক কিছু শেখা হয়ে যায়। শুধু নিজের বিদ্যালয়েই নয়, আঞ্চলিক বা রাজ্য-স্তরের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, অন্যদের আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখতে যাওয়া এগুলিও শিক্ষার পক্ষে আদর্শনি।

বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় ভ্রমণ (Visit to Science Mus'þüum) : প্ল্যানেটারিয়াম, বিড়লা বিজ্ঞান ও কারিগরি সংগ্রহশালা, যাদুঘর প্রভৃতি সংগ্রহশালায় ভ্রমণের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার অনেক বিষয় জানা যায়।

সমাজসেবা (Social Service) : মাঝে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কোন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে, তার ফল হয় সুদুর প্রসারী। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, প্রচার পদযাত্রা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে

একাত্মতাবোধ করতে শিখবে তেমনি, এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করতে পারবে।

বিতর্ক, সাহিত্যপত্র প্রকাশ ও আলোচনা সভা (Debate, Magazine, Publication and Seminar) : মাঝে মাঝে বিতর্ক সভার আয়োজন করে নিজেদের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শাণিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে নানাদিক থেকে বিচার করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। সাহিত্যপত্র, দেওয়াল পত্রিকা, প্রকাশ করে জনসংখ্যা শিক্ষার নানা তথ্য ও নিজেদের মতামত প্রকাশ করা যায়। আলোচনা আয়োজন করে বা আলোচনা সভায় যোগদান করে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শুনে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ছাড়াও নানা প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে নিজেদের সংশয়গুলি দৃঢ় করে নেওয়া যায়।

কুইজ প্রতিযোগিতা (Quiz competition) : এই বিষয়টি বর্তমানে যথেষ্ট জনপ্রিয়। কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং যে কোন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হয়। বলা বাহুল্য জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কুইজের ভূমিকা অসামান্য।

৫.৬ পরিকল্পিত পাঠ (Planned Lesson)

শিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে সংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য যে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হয় তাকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning)। যে কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকই বিষয়টি জানেন এবং তার প্রয়োগ করে থাকেন, পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা করে যে পাঠ দেওয়া হয় তাকেই বলা হয়েছে পরিকল্পিত পাঠ।

- পাঠ পরিকল্পনার প্রধান ধাপগুলি জানা থাকলে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে।
- পাঠ্যাংশ নির্বাচন, অর্থাৎ ক্লাসে কতটুকু অংশ পড়ানো হবে তার নির্বাচন।
- পাঠ্যাংশটির বিশ্লেষণ এবং ধারণা বা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে ভাগ করে নেওয়া।
- প্রতিটি ভাগের উদ্দেশ্য (Objective) স্থির করা এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত আচরণগুলি স্থির করা।
- প্রতিটি ভাগের শিক্ষণ পদ্ধতি কি হবে তা স্থির করা
- কি ধরনের উদাহরণ (Example), প্রদর্শন (Demonstration) ইত্যাদি দরকার তা স্থির করা।
- শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Aid) নির্বাচন।
- কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে, এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে তা স্থির করা।

পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ লেখা এবং গৃহকৃত্য (Hom task) স্থির করা।

৫.৭.১. সম্ভাব্য কয়েকটি শিক্ষণ পদ্ধতি (Some probable Teaching Methods) : অধিকাংশ শিক্ষণ পদ্ধতিই জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

- বক্তৃতা (Lecture) : শিক্ষক কর্তৃক একতরফা তথ্য প্রদান।
- আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (Heiristic Method) : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের ক্রমিক উন্মোচন।
- পরীক্ষণ (Experimentation) : শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- প্রোজেক্ট (Project) : অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কোন বিষয়ে দলবদ্ধভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বাছাই, তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রিপোর্ট তৈরি করা এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পারস্পরিক আলোচনা।
- এছাড়াও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে উল্লিখিত কিছু কিছু পদ্ধতি।

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সংস্থা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর কারণ শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এই স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষাদানের অনুকূল। তাছাড়াও ভবিষ্যৎ পরিবারিক জীবন ও বৃত্তি জীবনের জন্যও এই স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষা আবশ্যিক। বিদ্যালয় জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হলেও অনেকগুলি প্রথা বহির্ভূত সংস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ বিদ্যালয়ের বাইরেও বিপুল সংখ্যক জনগণ আছে যাদের জন্যও জন সংখ্যা শিক্ষা প্রয়োজন।

প্রথা বর্হিভূত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুক্ত বিদ্যালয়, জনশিক্ষা বিভাগ, গণ মাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদি প্রধান। জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সে জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একত্রে পাঠদানের দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হল সমন্বয় সাধন এবং অপরটি হল পাঠক্রমের সহগামিতা। সমন্বয় সাধনের দুটি পদ্ধতির প্রথমটির নাম মিলিতকরণ এই পদ্ধতিতে অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রমে যেখানে জনশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন অংশ আছে সেখানে জনশিক্ষার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সক্রিয় সমন্বয় সাধন, যেখানে প্রথমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্বাচন করে অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রম রচনার সময় সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়। সহগামিতার অর্থ দুটি স্বতন্ত্র পাঠক্রমের মধ্যে সাদৃশ্যের জায়গাগুলি তুলে ধরা, যা জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ভূমিকা খুবই বেশি। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রদর্শনী, সমাজসেবায় অংশগ্রহণ, বিতর্ক, সাহিত্যপত্র প্রকাশ, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্য

জনসংখ্যা শিক্ষার সহায়ক। শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে বক্তৃতা, আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি, পরীক্ষণ, প্রোজেক্ট ইত্যাদি।

৫.৮ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answers Questions)

(ক) প্রথাগত শিক্ষা কাকে বলে?

(খ) প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কর?

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে স্থান দেওয়া যায় কেন? একটি কারণ লিখুন।

(ঘ) মুক্ত বিদ্যালয় কী?

(ঙ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা কী হতে পারে?

(চ) মিলিত করণ কাকে বলে?

(ছ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধনকে সক্রিয় সমন্বয় বলা হয় কেন?

(জ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয়ের দুটি উদাহরণ দিন।

(ঝ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিতর্ক সভার ভূমিকা কী?

(ঞ) আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি কাকে বলে?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answers Questions)

(ক) সমন্বয় সাধনের দুটি পদ্ধতির তুলনা করুন।

(খ) সহগামিতা ও সমন্বয় সাধনের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

(ঘ) জনসংখ্যা শিক্ষা কেন মাধ্যমিক স্তরে শুরু করা উচিত ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(চ) জনসংখ্যা শিক্ষায় বিতর্ক, সাহিত্য পত্রিকা, আলোচনা সভা ইত্যাদির ভূমিকা কী?

(ছ) পরিকল্পিত পাঠ কী? পরিকল্পনার ধাপগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত পাঠক্রম সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) জনসংখ্যা শিক্ষায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির পরিচয় দিন।

(ঘ) যে কোন বিষয় অবলম্বন করে জনসংখ্যা শিক্ষার একটি পাঠ পরিকল্পনা রচনা করুন।

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

NCERT (1991), Population Education : A National Source Book. New Delhi.

Revunie, J. K. (1988) Population Resource and Development : A Guide Book, Gland, IUCN.

Bose. A. (1988), From Population to People-New Delhi. B. R. Publication.

Sharma, R. C. (1979) Population Education. Natun and Status, Bankok, UNESCO.

Sharma, R. C. (1984), Population Education, International Eneyclopedia of Population, Paris, UNESCO.

Choudhury, M. (1981) Population Dynamicy in India

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ কুমার ও ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ (1993) (সম্পাদক) জনসংখ্যা শিক্ষা : জীবনের সার্বিক বিকাশের শিক্ষা, কলকাতা : রাজ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গবেষণা পর্ষৎ।

PG Education 8 (E4)
Module 2

একক 6 □ পরিবেশ শিক্ষার ধারণা (Concept of Environmental Education)

গঠন

6.1 সূচনা

6.2 উদ্দেশ্য

6.3 পরিবেশ শিক্ষার অর্থ

6.3.1 পরিবেশ শিক্ষার সজ্ঞা

6.3.2 পরিবেশ শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

6.4 পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি

6.5 পরিবেশ শিক্ষার পরিধি

6.5.1 পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু

6.5.2 পরিবেশ শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞান

6.5.3. পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

6.6 পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য

6.6.1 প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য

6.6.2 পরোক্ষ উদ্দেশ্য

6.7 সারসংক্ষেপ

6.8 প্রশ্নাবলি

6.1 সূচনা (Introduction)

পরিবেশই মানব সভ্যতার প্রকৃত ধাত্রী। প্রথম প্রাণের সূত্রপাত যে ভৌত পরিবেশে ঘটেছিল, সেখান থেকেই ধাপে ধাপে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হল জৈব পরিবেশ। মানুষ এল সবার শেষে, শুরু হল তার প্রকৃতিকে জয় করার লড়াই, প্রবল প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় ক্ষুদ্র মানব সম্প্রদায়ের আপ্রাণ বেঁচে থাকার চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে মানুষ যতই শক্তিশালী হতে থাকল ততই পিছু হঠতে শুরু করল প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মানুষ প্রকৃতির মৌলিক রূপ নিজের মত করে পরিবর্তন করে নিয়ে আরও স্বাচ্ছন্দ্য, আরও আরামের সন্ধানে ধ্বংস করতে শুরু করল নিজেরই ধাত্রী পরিবেশকে। গৃহনির্মাণ, নগরায়ণ, সুখভোগের নানা উপকরণ যোগানোর জন্য অগণিত কল কারখানা, তাদের বর্জ্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, নির্বিচারে ভূগর্ভের জল তোলা, প্রাকৃতিক সম্পদ বেপরোয়া ভাবে নষ্ট করা, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করা, এই সবের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল অস্তিত্বের সংকট। প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, দাবানল, প্রভৃতি বিপর্যয় এবং

সেই সঙ্গে মারণ রোগের বিস্তার, জনসংখ্যার লাগামছাড়া বৃদ্ধি এই সব বিষয়ে কিছুটা চেতনা জাগ্রত হল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন মানব সভ্যতা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং পরিবেশ দূষণ ও প্রকৃতি ধ্বংস হাত ধরাধরি করে, আমাদের এক অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এই উপলব্ধি থেকেই শুরু হল পরিবেশ সচেতন বিজ্ঞানী ও অন্যান্য মানুষের আলাপ আলোচনা, সভা সমাবেশ, পুস্তক রচনা, গবেষণা ও নানাভাবে পরিবেশ বাঁচানোর সক্রিয় চেষ্টা। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের শাখা থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান একত্রিত করে জন্ম হল পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) নামক বিদ্যাচর্চার এক নতুন শাখার। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে পরিবেশ সংরক্ষণের চেষ্টা শুধু মাত্র কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে তার অংশীদার করতে হবে। আর সর্বস্তরে পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এই কাজ সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ শিক্ষা (Environmental Education) নামক শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় তৈরি হল। বর্তমান পাঠ্যাংশে পরিবেশ শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে। শুরুতে পরিবেশ শিক্ষার একটি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে তার পর পরবর্তী অংশের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হবে।

6.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ শিক্ষার—

- অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা করতে পারবেন।
- সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

6.3 পরিবেশ শিক্ষার অর্থ (Meaning of Environmental Education)

মানুষ পরিবেশের কোলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভিন্নতর পরিবেশে লালিত হয়। জন্ম পরবর্তী পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় সেখানেই। নিজের অজ্ঞাতে সদ্যোজাত শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বড় হতে থাকে। পরিবেশ সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সুপ্ত চেতনা থাকলেও পরিবেশকে সে ততটাই জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করে যতটা তার নিজের জন্য প্রয়োজন। সেজন্য পরিবেশের নানা বিচিত্র রূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা কখনোই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানে পরিণত হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবেশ সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান নিয়েই তাদের জীবন কেটে যায়। তারা তাৎক্ষণিক সুখ ও আরামের জন্য নানাভাবে পরিবেশকে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ধ্বংস করতে দ্বিধা করে না। পরিবেশ শিক্ষার তাৎপর্য এখান থেকেই শুরু।

ইংরাজী Environmental Education এর সঠিক বঙ্গানুবাদ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা যা পরিবেশ শিক্ষার একটি অংশ মাত্র। সেজন্য অনেক গ্রন্থকার Environment Education কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। কারণ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা কথাটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে তা প্রায় সাধারণ শিক্ষার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মানুষের সমস্ত শিক্ষাই কোনও না কোন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলায় পরিবেশ শিক্ষা (Environment Education) নামক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

- পরিবেশের জন্য শিক্ষা (Education for the environment)
- পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষা (Education within the environment)
- পরিবেশের সাহায্যে বা মাধ্যমে শিক্ষা (Education by or through the environment)

অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু পরিবেশ. সেই শিক্ষা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (যেমন, শুধুমাত্র বই পড়ে) লাভ করা যায় না এবং পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উপাদান, পদ্ধতি বা শিক্ষক পরিবেশ নিজেই। পরিবেশ শিক্ষার এই মৌলিক অর্থটির উপর ভিত্তি করে এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে।

6.3.1 পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য এবং সম্ভবত প্রথম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন UNSCO'র উদ্যোগে The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 1970 সালে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভায় (International Working Meeting on Environmental Education in the School Curriculum) বলা হয়।

মানুষে মানুষে, তাদের কৃষ্টি ও জৈব-ভৌতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে বোঝা ও উপভোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রতিন্যাসের বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশে উপযুক্ত মূল্যবোধ চিহ্নিত করা ও ধারণাগুলির ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া হল পরিবেশ শিক্ষা। পরিবেশের গুণমান বজায় রাখার জন্য নিজের মত করে আচরণবিধি তৈরি করা ও তাকে কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণও পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

("Environmental education is the process of recognizing values and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in dicision making and self-formulation of a code of behaviour about issues concerning environmental quality")

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিল মনে হলেও এর মধ্যে পরিবেশ শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যার পূর্বে The Finish National Commission (1974)-এর বক্তব্যটিও উল্লেখ করা দরকার।

পরিবেশ শিক্ষা পরিবেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার একটি পদ্ধতি। পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা বা চর্চার বিষয় নয়। জীবনব্যাপী সমন্বিত শিক্ষার নীতি অনুযায়ী এই শিক্ষা বজায় রাখা দরকার।

("Environmental education is a way of implementing the goals of environmental protection. Environmental education is not a separate branch of science or subject of study, it should be carried out according to the principle of lifelong integral education")

এছাড়াও 1977 সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার জর্জিয়াতে অনুষ্ঠিত UNESCO'র

Tbilisi Conference-এ (UNEP বা United Nation Environmental Programme আয়োজিত) পরিবেশ শিক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সেখানে পরিবেশ শিক্ষার একটি বা দুটি বাক্যে সংজ্ঞা দেওয়া অপেক্ষাও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেজন্য Tbilisi Conference এর সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী অংশগুলিতে উল্লেখ করা হবে। আপাতত এখানে দেখা দরকার পরিবেশ শিক্ষার উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞা থেকে কোন্ কোন্ প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার উপযোগী।

পরিবেশ শিক্ষা বিশেষ কতগুলি মূল্যবোধকে চিহ্নিত করে সেগুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

● পরিবেশ কথাটির অর্থ একটি জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে তাদের জৈবিক পরিমণ্ডলের সম্পর্ক, ভৌত পরিমণ্ডল, মানুষ ও জৈব পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানুষের কৃষ্টির সঙ্গে এই সবকয়টির সম্পর্ক, এই সব মিলে যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জ্ঞান তৈরি করেছে, প্রত্যেক মানুষেরই তা জানা ও বোঝা দরকার। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকেই এই সম্পর্ক জানতে ও বুঝতে পারে।

● পরিবেশের উপাদানগুলির সম্পর্ক জানা, বোঝা ও আত্মস্থ করার জন্য প্রয়োজন পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও বিশেষ ধরনের দক্ষতা। পরিবেশ শিক্ষাই ঐ সব দক্ষতা ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস বিকাশের প্রকৃত বাহন।

● পরিবেশের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য এক পরম উপভোগের বিষয়। ভোগের জন্য পরিবেশ ধ্বংস না করে, পরিবেশকে অবিকৃত রেখে তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার শিক্ষাও পরিবেশ শিক্ষা থেকেই লাভ করা সম্ভব।

● পরিবেশের গুণমান বজায় রাখার জন্য দরকার বিশেষ পরিবেশবান্ধব আচরণবিধি। এই ধরনের আচরণবিধি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। নিজস্ব জ্ঞান, প্রতিন্যাস, বিচারবোধ, এবং পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের থেকে আচরণ বিধি তৈরি করে নিতে হয়। পরিবেশ শিক্ষার ফলে ব্যক্তি নিজের আচরণবিধি নিজেই তৈরি করে নিতে পারে।

● সবশেষে আচরণবিধি স্থির করাই যথেষ্ট নয়। কারণ পরিবেশবান্ধব আচরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংযম, স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা। সুতরাং যত বাধাই আসুক না কেন নিজের আচরণবিধি পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তিও পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যায়। এখানেই পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম সার্থকতা।

6.3.2 পরিবেশ শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief History of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার উৎস সন্ধান করতে হলে ফিরে যেতে হয় অতি প্রাচীন কালে। প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি। সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে মানুষের মনে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা তৈরি হত, প্রকৃতির সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হত। বৈদিক সভ্যতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ আরও নিবিড় হয়ে উঠল। অসংখ্য বৈদিক প্রার্থনামন্ত্রে প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির জন্য মানুষের গভীর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশ, বাতাস, উদ্ভিদ, প্রাণি সবকিছুই যাতে মধুময় সুন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য দেবতাদের কাছে বার বার প্রার্থনা করেছেন তারা।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রার্থনাই নয়, সেই সময়ে ভোগ্যবস্তুর তুলনায় ভোগী মানুষের সংখ্যা ছিল নগন্য। কিন্তু অপরিমিত ভোগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে নানা বাধা নিষেধ, ব্রত পালনের নিয়ম কানুন, উৎসব আচার অনুষ্ঠান, উপবাস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় বিধিনিষেধের শক্তি সবচেয়ে বেশি বলেই তা জীবনযাপন ও ধর্মাচরণের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মাচরণ ক্রমশ আচার

সর্বস্ব হয়ে উঠল। ফলে প্রকৃতি সংরক্ষণ করার তাৎপর্য অন্ধ বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের তলায় চাপা পড়ে গেল। একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উদ্ভিদ ও তার ভেষজগুণ সম্বন্ধে বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও ভেষজ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে সেকালের মানুষ বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে আয়ুর্বেদের ব্যাপক অবনতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে মূল্যবোধেরও ক্রমশ হানি ঘটতে থাকল। সুতরাং যদি প্রাচীন কালকে পরিবেশ শিক্ষার আদি পর্ব হিসাবে মানা যায়, তবে বলতে হয় সেই পরিবেশ শিক্ষা ছিল পরোক্ষ, প্রথা বহির্ভূত (Non-formal) এবং আচার নির্ভর।

আধুনিক ধারায় পরিবেশ শিক্ষার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। 1899 সালে স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক Patrick Geddes, The Outlook Tower নামে একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি মনে করতেন পরিবেশ ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল সুতরাং শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়ন একযোগে করতে হবে— একটির উন্নতি হলে অপরটিরও উন্নতি হবে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা দার্শনিকরা প্রকৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করার কথা বলেছেন। রুশো শিশুর শিক্ষায় প্রাকৃতিক উপাদানকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার সাযুজ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কেউই প্রকৃতির জন্য, প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতির সাহায্যে শিক্ষা—এইভাবে বিষয়টিকে দেখেননি।

George Perkin Marsh একটি বই (Man and Nature or Physical Geography) লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে সভ্যতা বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না।

1908 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Theodore Roosvelt হোয়াইট হাউসে প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের সভা ডাকেন। ঐ সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পরিবেশ সংরক্ষণ। কিন্তু তার জন্য পরবর্তীকালে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিনা তা খুব স্পষ্ট নয়। পরিবেশ শিক্ষা কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় Keele বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পরিবেশ শিক্ষাকে শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এর ফলে সর্বপ্রথম সকলে উপলব্ধি করেন জীববিদ্যা আর জীবজগতের ভারসাম্য সম্বন্ধে শিক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। পরিবেশ শিক্ষা সে তুলনায় অনেক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী।

বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের আরও কিছু কিছু উদ্যোগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেওয়া হলেও প্রকৃত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া হয় 1972 সালে। স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় মানব পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে (International Conference on Human Environment) পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত জন্মভূমি বলা যায়। এই সম্মেলনে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কার্যক্রম (United Nations Environment Programme) গৃহীত হয় এবং UNESCO'র সঙ্গে যৌথভাবে 1975 সালে আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমের (Inernational Environment Education Programme) সূচনা হয়।

IEEP'র উদ্যোগে, 1975 সালে বেলগ্রেডে আন্তর্জাতিক পরিবেশশিক্ষার কর্মশালা (International Workshop on Environmental Education) অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার প্রস্তুতি হিসাবে এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা যায় অধিকাংশ দেশই পরিবেশ শিক্ষার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে এবং চারটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে। এই চারটি স্তর,

- প্রাথমিক শিক্ষা।
- মাধ্যমিক শিক্ষা।
- আঞ্চলিক স্তরের শিক্ষা।
- বিদ্যালয় বাইর্ভূত শিক্ষা।

সেই সঙ্গে অধিকাংশ দেশই প্রথাগত এবং প্রথা বহির্ভূত এই দুই প্রকার শিক্ষার সঙ্গেই পরিবেশ শিক্ষাকে যুক্ত করার স্বপক্ষে মত দিয়েছে। বেলগ্রেড কর্মশালা থেকে চারখণ্ডে বিভক্ত বেলগ্রেড সনদ (Belgrade Charter) রচিত হয়। এই চারটি খণ্ডের বিষয়বস্তু,

- পরিবেশের পরিস্থিতি (Environmental situation)
- পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য (Environmental Goal)
- পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য (Environmental Education Goal)
- পরিবেশ শিক্ষার লক্ষ্য (Environmental Education Objectives)

বেলগ্রেড কর্মশালার পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। 1976 সালের এপ্রিল মাস থেকে 1977 সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপ, উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে এবং এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে 1976 সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককে এশিয় সম্মেলন হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল,

- বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ শিক্ষার কার্যক্রমগুলি আলোচনা করা।
- বেলগ্রেড কর্মশালার সুপারিশ ও নির্দেশগুলির পুনরালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন।
- আঞ্চলিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

ব্যাঙ্ককের এশিয় সম্মেলনে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পায় তার মধ্যে আছে,

- পরিবেশ শিক্ষার কার্যপ্রণালী।
- প্রশিক্ষণ।
- প্রথাবহির্ভূত পরিবেশ শিক্ষা।
- পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ তৈরি করা।

আঞ্চলিক সম্মেলনের পর 1977 সালে জর্জিয়ায় Tbilisi সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং তার পর আবার আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1980 সালে ব্যাঙ্ককে। এই সম্মেলনে, পরিবেশ শিক্ষার প্রায় সমস্ত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং পরস্পর অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটে। যেমন, পাঠক্রম তৈরি করা, শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষণের কার্যক্রম সংগঠিত করা, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে পরিবেশ শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর করা ইত্যাদি। এই সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাখা সংগঠনগুলির বিশেষজ্ঞরা, যথা, UNESCO, WHO, WMO, ILO, FAO ইত্যাদি নানাভাবে সাহায্য করে।

এই সব কার্যক্রমের ফলে পরবর্তী সময়ে এক একটি দেশ তার নিজের মত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ হল,

- পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন। যেমন, চীন, ভারত, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা দূষণ নিরোধক আইন প্রণয়ন করে। কোরিয়া পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে।

- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র সংগঠন স্থাপন করা। যেমন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (Pollution Control Board) আদালতের গ্রিন বেঞ্চ ইত্যাদি।
- পরিবেশ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া। যেমন, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষার প্রায় প্রতিটি স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমেও পরিবেশ শিক্ষা অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিজ্ঞান চর্চা, পঠন পাঠন ও গবেষণা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পরিবেশ বিজ্ঞান ও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র তবুও উপরোক্ত চর্চা ও গবেষণা পরিবেশ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পদ্ধতিকে সমৃদ্ধি করে চলেছে।

6.4 পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি বিচার করার আগে জানা দরকার পরিবেশ বলতে কি বোঝায়? পরিবেশ ও ইকোলজি এই দুটি শব্দ অনেকের কাছে সমার্থক বলে মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই শব্দ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত হলেও কিছুটা ভিন্নার্থক। পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

সমস্ত রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌতিক অথবা রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয় যা মানুষের চারপাশের পরিমণ্ডল রচনা করে তাই হল পরিবেশ। (Environment is the sum of all social, economical, biological, physical or chemical factors which constitute the surroundings of man)।

অপেক্ষাকৃত সরলতর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

পরিবেশ অর্থে বোঝায় কোন একটি দেশ এবং কালে যে সব পরিস্থিতি মানুষকে ঘিরে রাখে তার সমষ্টি (Environment refers to the sum total of conditions which surround man at a given point in space and time)।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় দেশ এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের সংজ্ঞা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে, পরিবেশ পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল একটি ধারণা। কিন্তু মানুষের চারপাশের সামাজিক, ভৌত এবং জৈবিক উপাদানগুলির সমষ্টি যে পরিবেশের ভিত্তি এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তবে উভয় সংজ্ঞাতেই পরিবেশের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, মানুষের সঙ্গে তাদের, সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি উহ্য থেকেছে। এমন ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যেন পরিবেশ একটি নিষ্ক্রিয় পরিমণ্ডল মাত্র।

ইকো (Eco) কথাটির অর্থ গৃহ। সুতরাং ইকোতন্ত্র (Ecosystem) কথাটির অর্থ দাঁড়ায় জীবকুলের আবাস বা ধারক এবং তাদের সম্মিলিত একটি সংগঠন। আর ইকোলজি (Ecology) অর্থ মানুষ ও অন্যান্য জীবকুলের আবাস যে প্রকৃতি, তার বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চর্চা (Study of the interrelation, interdependence and interaction of the factor of nature which forms the abode of man and other living organisms)। মানুষ জীবিত প্রাণিকুল এবং প্রকৃতির অংশ। সেই অর্থে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরতার বিষয়টিই ইকোলজির চর্চার বিষয়।

উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখলে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ হবে।

জীবন ব্যাপী শিক্ষা (Life long education) : যেহেতু পরিবেশ কোন স্থিতিশীল বস্তু নয়, দেশ ও কালভেদে তার পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু পরিবেশ শিক্ষাও জীবন ব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত হলেও পরবর্তী জীবনেও তার ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। না হলে পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আচরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্য (Study material of Environmental Education) : পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্য, পরিবেশ নিজেই। ইকোলজির সংজ্ঞায় যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার তাৎপর্য অনুযায়ী পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের চারপাশের জৈবিক ও ভৌত উপাদানগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে অবহিত হবে। সুতরাং পরিবেশকে জানা বোঝা পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয় (Environmental Education is multidisciplinary) : পরিবেশ বিজ্ঞান যেমন কোন স্বতন্ত্র মৌলিক বিদ্যা নয়, তেমনি পরিবেশ শিক্ষাও কোন আলাদা বিষয় নয়। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, ইত্যাদি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যেই পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র এই সব বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিবেশলব্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে পরিবেশ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা দরকার। সেইজন্য পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয়।

পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি ও ক্ষেত্র, পরিবেশ (Method and field of Environmental Education is environment itself) : সম্ভবত আর কোন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও ক্ষেত্র একই। পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে পরিবেশ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পরিবেশের বুকে পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় আদান প্রদানের মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষা সার্থক হতে পারে। সেই কারণেই বলা হয়েছে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি পরিবেশ নিজেই।

পরিবেশ শিক্ষা অংশগ্রহণমূলক (Environmental Education is Participatory) : পরিবেশ থেকে দূরে থেকে যেমন পরিবেশ শিক্ষা হয় না তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থান থেকেও পরিবেশ শিক্ষা হয় না। প্রথম দিকে অনেকেই ভেবেছিলেন পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা (Awareness), পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive attitude) এবং মূল্যবোধ তৈরি হলে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব আচরণ আয়ত্ত করা সহজ হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে একমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে এবং পরিবেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে তার মধ্যে দিয়েই পরিবেশ সচেতনতা তৈরি হওয়া সম্ভব। সক্রিয়তাই প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। সুতরাং শুধু মাত্র বই পড়ে বা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে পরিবেশ শিক্ষা হয় না, সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

পরিবেশ শিক্ষা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত (Environmental Education is related to the Other Controlling forces) : যেহেতু পরিবেশের উপাদান হিসাবে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শক্তিগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনও না কোনও ভূমিকা নিয়ে থাকে সেহেতু পরিবেশ শিক্ষা ঐ সব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, কোন দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভূমিকা কি তা বোঝা দরকার। যদি বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয় এবং সামাজিকভাবে অরণ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবেগ ও সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা থাকে (যেমন, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে) তবে ঐ সব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির কথা অগ্রাহ্য করে নীতি নির্ধারণ করলে তা

কার্যকর করা কঠিন। এই ধরনের আরও উদাহরণ দিলে দেখা যাবে। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে ঐসব জটিল নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলি সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার।

6.5 পরিবেশ শিক্ষার পরিধি (Scope of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক, এই নিয়েই পরিবেশ শিক্ষার পরিধি সংক্রান্ত আলোচনা করা দরকার। ইতিমধ্যেই পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হল।

6.5.1 পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter of Environmental Education)

পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার এক একটি স্তরে ভিন্ন রকম।

প্রাথমিক স্তর (Elementary level) : প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই পরিবেশ শিক্ষার সূচনা হতে পারে কিন্তু পরিবেশ শিক্ষা নামক স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে নয়। এই স্তরে, শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবে। চারপাশের গাছপালা, পশুপাখি, ফুলফল, জল, বাতাস, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি যা কিছু প্রত্যক্ষগোচর সে সম্বন্ধে তারা পরিচিত হবে শিক্ষক ও পিতামাতার সহযোগিতায়। কিভাবে কীট পতঙ্গ উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। কিভাবে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে সাধারণ প্রাণীরা পরস্পর আবদ্ধ, মানুষের জীবনে তাদের গুরুত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে কোন তাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়াই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে শিশুরা। এই ধরনের প্রকৃতি পরিচিতি তাদের পরবর্তী পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করবে। সেই সঙ্গে পরিবেশের প্রতি অনুরাগ ও একাত্মতা বোধ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও প্রাথমিক স্তরে শিশুদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশবান্ধব আচরণ ও অভ্যাস আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছের লালন পালনের দায়িত্বও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমেও পরিবেশ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ ও পরবর্তীকালে মূল্যবোধ তৈরির ভিত্তি প্রস্তুত হবে।

- **মাধ্যমিক স্তর (Secondary level) :** মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত করা হয়।

—পরিবেশের উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন (Acquiring Knowdege about the components of environment) : পরিবেশ একটি সামগ্রিক ধারণা হলেও তার যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আছে সে সম্বন্ধে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পরিবেশের ভৌত, সামাজিক ও জৈব উপাদানগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা বিষয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। সেগুলি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা দরকার এবং যে সবক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা আছে সে ক্ষেত্রে তা পূর্ণ করা দরকার।

—উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter / relation of the Components) : পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের পূর্ণাঙ্গ রূপটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা তৈরি হয়। সেজন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু এই কাজ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বক্তৃতার মাধ্যমে সফল করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একমুখী বিষয় ভিত্তিক তথ্যের

উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

—পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার চিহ্নিত করণ (**Identification of the Environmental Problems**) : মানুষের কাছে অনেক সময়ই পরিবেশের বিপদগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। নিজের অজ্ঞাতেই তারা দূষণ ছড়ায়, পরিবেশ নষ্ট করে। তাৎক্ষণিক আনন্দের জন্য সুদূর প্রসারী ক্ষতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যায়, অপচয় করে কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম কাজ পরিবেশের বিপদগুলি সম্বন্ধে কিশোর কিশোরীদের সচেতন করে তোলা। যে সব সমস্যা এখনই ক্ষতি করছে, যে সব সমস্যা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ক্ষতি করবে সে সব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

—সমস্যাগুলির কারণ অনুধাবন করা (**Understanding the causes of these Problems**) : শুধু মাত্র সমস্যাগুলি চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম বিষয় ঐসব সমস্যার প্রাথমিক কারণগুলিকে তুলে ধরা। ধর্মীয় কারণে জলাশয় দূষণ, ভূগর্ভস্থ ও ভূস্তরের জল সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহারের কারণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, প্রাণি ও উদ্ভিদ ধ্বংস করার কারণগুলি সহজবোধ্য ভাবে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

—প্রতিকারের দক্ষতা অর্জন (**Acquisition of Remedial Skills**) : সমস্যা ও সমস্যার কারণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষা তার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীরা দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারে না ঠিকই কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় পরিবেশবান্ধব আচরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারে। সেজন্য যে সমস্ত আচরণগত দক্ষতা (Behavioural Skill), সামাজিক দক্ষতা (Social Skill), প্রজ্ঞামূলক দক্ষতা (Cognitive Skill) ইত্যাদি দরকার—পরিবেশ শিক্ষা সেইসব দক্ষতা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

—আনুষঙ্গিক মূল্যবোধের শিক্ষা (**Associated value education**) : পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী জীবনে শৃংখলা ও সংযম আয়ত্ত করার শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষের মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাসের ভিত্তি। পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ সংরক্ষণের দক্ষতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া সবকিছুর সঙ্গেই যুক্ত শৃংখলাবোধ ও সংযম। প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে এই গুণগুলি আয়ত্ত হলে, গোষ্ঠী জীবনে তার প্রভাব পড়ে। যেমন, জনসংখ্যার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বুঝলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনগুলিও স্পষ্ট হয়ে যায়, ব্যক্তিজীবনে তার প্রভাব পড়ে। এই দিক থেকে পরিবেশ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

—উচ্চতর শিক্ষা (**Higher Education**) : উচ্চতর শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা নির্বাচনধর্মী এবং বিশেষজ্ঞতামুখী (Selective and specialization oriented)। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্ষমতা, পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী কিছু কিছু নির্বাচিত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার জন্য শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার যে ভিত্তি তৈরি হয় তাকে আরও দৃঢ় ও নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ পরিবেশ বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে। পরিবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান লাভের জন্য কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষাকে সংযুক্ত করা দরকার। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশকে বিচার করতে শিখবে, সমাজ বিদ্যার শাখাগুলিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা আলাদা হতে পারে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য উভয়ের জন্য একই।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা

(Environment and Environment related Research)। গবেষণা নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয়। নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে আর সেই সঙ্গে ক্রমাগত শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে চলে। এই কাজগুলিই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধান বিষয়।

- সর্বস্তরের সাধারণ বিষয় (**Common subjects in all stages**) : পরিবেশ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে শিক্ষকরা কাজ করে থাকেন। এই বিষয়গুলি পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে তার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট।

- পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম।
- পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ।
- পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি।
- পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।
- পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়ন।

6.5.2 পরিবেশ শিক্ষা ও অন্যান্য বিজ্ঞান (Environmental Education and Other Sciences) :

পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বয়। এখানে কয়েকটি বিষয়ের কথা তুলে ধরা হল। তার আগে স্মরণ করা দরকার পরিবেশ শিক্ষার Tbilisi সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাখা সংগঠনগুলির (United Nations Education, Social and Cultural Organization, World Health Organization ; World Meteriological Organization ; International Labour Organization ; Food and Agricultural Organization, ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কারণ তখন থেকেই পরিবেশ শিক্ষার বহুমুখিতা স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল।

- পদার্থবিদ্যা (**Physics**) : পদার্থবিদ্যা আমাদের ভৌত পরিমণ্ডল, শক্তি (Energy), তাদের উৎস ও ধর্ম, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পদার্থের স্বরূপ ও গঠন ইত্যাদি বিষয়ের বিজ্ঞান। সুতরাং পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত পদার্থবিদ্যার কাছে ঋণী। শক্তির রূপান্তরের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কটি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- রসায়ন (**Chemistry**) : আমাদের চারপাশের জগতে পদার্থের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে মৌলবস্তু ও যৌগগুলির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে পরিবেশের চরিত্র নির্ধারণে তার ভূমিকা অনিবার্য। রসায়নের তিনটি প্রধান শাখা— অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry), জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) ও ভৌত রসায়ন (Physical Chemistry) সমানভাবে পরিবেশ বিষয়ে কার্যকারণ ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে। সেজন্য রসায়ন পরিবেশ বিদ্যা ও শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি।

- গণিত (**Mathematics**) : গণিত হল সমস্ত বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ভিত্তি। পরিবেশ শিক্ষায় গণিত প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও, পরিবেশ সংক্রান্ত গাণিতিক মডেল (Mathematical Model) পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চিন্তাকে পরিশীলিত করে।

- প্রাণি ও উদ্ভিদ বিদ্যা (**Zoology & Botany**) : প্রাণি ও উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইকোলজির আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা প্রধান দুটি ইকোতন্ত্রের কথা বলেন— জৈবিক (Biotic) এবং অজৈবিক (Abiotic)। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে জীবজগতের ভারসাম্যই পরিবেশ শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয়।

● শারীর বিদ্যা (Physiology) : প্রাণি বিদ্যারই বিশেষ শাখা হলেও মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের গঠন ও কাজ, দেহরসগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ও বিপুল জ্ঞানের উৎস শারীর বিদ্যা। পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শরীরের ও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের পরিবর্তন, দূষণ, ইত্যাদি সবচেয়ে, বেশি প্রভাবিত করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, কোষকলাতন্ত্র ইত্যাদি সবকিছুকে। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষা শারীর বিদ্যার জ্ঞান ছাড়া হতে পারে না।

● মনোবিজ্ঞান (Psychology) : মনোবিজ্ঞান মানুষের সমস্ত রকম আচরণের প্রকৃতি ও কারণ নিয়ে গবেষণা করে। আমাদের সংবেদন-প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, মনোযোগ, চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের চর্চার বিষয়। পরিবেশের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের দ্বিমুখী সম্পর্ক। একদিকে পরিবেশ ক্রমাগত আমাদের আচরণের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে আমাদের অবাঞ্ছিত আচরণের ফলেই পরিবেশের ক্ষতি হয়। সেজন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, মূল্যবোধ গঠন, সহায়ক আচরণ আয়ত্ত করা সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিবেশ শিক্ষাকে নির্ভর করতে হয় মনোবিজ্ঞানের উপর।

● শিক্ষা (Education) : শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে দীর্ঘকাল ধরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকরণ, পদ্ধতি, প্রযুক্তি, পাঠক্রম, পরিমাপ ও মূল্যায়ন সবকিছুর ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও শিক্ষার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান। পরিবেশ শিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেদিক থেকে পরিবেশ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত।

● অন্যান্য বিদ্যা (Other disciplines) : পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তালিকা দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে কিন্তু শেষ করা কঠিন। পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) প্রকৃত পক্ষে একটি বহুবচন বাচক শব্দ। আবহাওয়া বিজ্ঞান (Meteriology), সমাজবিদ্যা (Sociology), ইতিহাস (History), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), অর্থশাস্ত্র (Economics) প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই পরিবেশ শিক্ষার কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। জনবিজ্ঞান (Demography), জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education) ও রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক আরও নিবিড়। কারণ পরিবেশ ও জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উপর পরিবেশের গুণগত মান বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রাশিবিজ্ঞান পরিবেশ বিষয়ক পরিমাণগত তথ্যের (Quantitative data) বিন্যাস ও বিশ্লেষণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য। আর এই সব সিদ্ধান্তের অনেকটাই পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

6.5.3 পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Environmental Education) :

পরিবেশ শিক্ষা সর্বস্তরে একান্ত আবশ্যিক হলেও এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

● পরিবেশ শিক্ষা সরাসরি পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণা করে না। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম, পদ্ধতি ও প্রকরণ বিষয়ে গবেষণা ও পরিবেশ শিক্ষার ফলাফল এই বিদ্যার চর্চার বিষয়। এই কারণে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাছে কখনও কখনও কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে।

● পরিবেশ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প নয়, কিছুটা পরিপূরক। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলি শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরলেও, মৌলিক বিদ্যা চর্চায় যেন বাধা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যেমন, সালোকসংশ্লেষের (Photosynthesis) মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডের বিশ্লেষণ ও অক্সিজেনের বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণের একটি বিশেষ দিক। কিন্তু সেজন্য সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মূল প্রসঙ্গটিকে অবহেলা করলে চলবে না।

● পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনে ও গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে

পরিবার ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি ও পরিস্থিতির প্রভাব সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনেক সময় ঐ সব প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা অকেজো হয়ে যায়।

● পরিবেশ শিক্ষায় বহুব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করাতে পারলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু সীমিত সময়, শক্তি ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতার দরুণ তা সম্ভব হয় না। ধীরে ধীরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ে এবং গতানুগতিক শিক্ষায় পরিণত হয়।

● শিক্ষকদের উদ্যম, উৎসাহ এবং প্রশিক্ষণের উপর পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু সমস্ত শিক্ষক সমান উৎসাহী বা উদ্যমী নন। ফলে পরিবেশ শিক্ষা অনেক সময়ই নিয়ম রক্ষায় পর্যবসিত হয়।

● অতিরিক্ত পরীক্ষা নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরি করার চেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা পরীক্ষায় তার গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্য আরোপ করে থাকেন। তখন পরিবেশ শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

● পরিবেশ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ের সার্থকতা বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ তখনই সফল হতে পারে যখন সকলের সক্রিয় সমর্থন, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে উদাসীন থাকলে পরিবেশ শিক্ষা কাগজে কলমে অর্জিত বিদ্যা হয়ে থাকবে, কখনই তার ফলাফল পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

6.6 পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Environmental Education)

পূর্ববর্তী আলোচ্য অংশগুলিতে পরিবেশ শিক্ষার অনেকগুলি উদ্দেশ্য নানা ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টভাবে একত্রে উল্লেখ না করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলি সম্বন্ধে ধারণালাভ করা কঠিন। যদিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে সঠিক সীমারেখা টানা যায় না তবুও আলোচনার সুবিধার্থে এই দুই ভাগে ভাগ করে উদ্দেশ্যগুলি নিচে দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে এই সব উদ্দেশ্যগুলি নানাভাবে Tbilisi ও ব্যাঙ্কক সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে।

6.6.1 প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য (Direct Objectives)

সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিও তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। প্রজ্ঞামূলক (Cognitive), অনুভবমূলক (Affective) এবং সঞ্চালনমূলক (Psychomotor), এই তিন প্রকার উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করে এখানে উদ্দেশ্যগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল।

● চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge) লাভ করার জন্য পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজন।

● চারপাশের মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ ও ভৌত পরিবেশের বাইরে যে বৃহত্তর পরিমণ্ডল আছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

● পরিবেশ সংক্রান্ত পদ (Term), সংজ্ঞা, গতিপ্রকৃতি (Trend), সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

● জৈব ও অজৈব (Biotic and Abiotic) প্রকৃতির সম্পর্ক অনুধাবন করা।

● সম্পদ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা।

● সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার তথা অপচয়ের তাৎপর্য বোধ হওয়া এবং অবশ্যই অপব্যবহারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা।

● সম্পদের সুষম বন্টন ও সদ্ব্যবহারের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি চিহ্নিত করা।

● উপরোক্ত ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে পার্থক্য করার দক্ষতা অর্জন।

● দূষণের কারণ ও প্রভাবগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য পদ্ধতিগুলি জানা।

● পরিবেশ সম্বন্ধীয় তথ্য আহরণ করা, তাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা।

● বিভিন্ন পরিস্থিতি, ঘটনা, সিদ্ধান্ত, আচরণ ইত্যাদির পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করা।

● পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও তার মধ্যেকার খুঁটিনাটি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন। পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পরিবেশ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

● পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয়গুলির তৎপরতা বৃদ্ধির চেষ্টা। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ত্বক সংবেদন, ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণের তৎপরতা পরিবেশের মধ্যেকার ছোটখাট পরিবর্তনগুলিও জানতে বুঝতে সাহায্য করে। অনেক সময় বৃহত্তর পরিবেশ অবনমনের সূচনা ছোটখাট পরিবর্তনের মাধ্যমেই বোঝা যায়।

● পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য নানাভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করা। যেমন, লিখন, চিত্রাঙ্কন, গ্রাফ ও ম্যাপ তৈরি, সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার, ইত্যাদি।

● প্রাণি ও উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া।

● প্রকৃতি ও পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক রূপ উপলব্ধি করা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা।

● ভালোমন্দ নির্বিচারে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সমস্ত স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে নিজের আচরণকে পরিবর্তন করার মনোভাব।

● সঠিক মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস গঠন।

● বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নানা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের উৎসাহ।

● দূষণ নিরোধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহ।

● সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জনমত গঠন, পরিবেশ নষ্টকারী আচরণ প্রতিরোধের সাহস, দক্ষতা ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রকৃত অংশগ্রহণ।

● পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সঠিক মতামত প্রদানের দক্ষতা।

● বিকল্প শক্তির ব্যবহার, পরিবর্তন সহ্য করার (Tolerance) ক্ষমতা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, এবং প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ করার মানসিকতার বিকাশ।

অন্যদিকে UNESCO পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছে।

● সচেতনতা (Awareness) : ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে, সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে ওঠার শিক্ষা।

● জ্ঞান (Knowledge) : সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে জানা ও বোঝার জন্য শিক্ষা।

● প্রতিন্যাস (Attitude) : ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির পরিবেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে সক্রিয়তার প্রেরণা, ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ বিকাশের শিক্ষা।

● দক্ষতা (Skill) : পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা।

● মূল্যায়নের ক্ষমতা (Evaluation ability) : পরিবেশ, পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা এবং প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করার শিক্ষা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নান্দনিক ও নৈতিক কোন প্রসঙ্গই মূল্যায়ন ও বিচারের বাইরে থাকবে না।

● অংশগ্রহণ (Participation) : ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলগতভাবে পরিবেশ সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করা, অন্যকে অংশগ্রহণে প্ররোচিত করা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করার শিক্ষা।

এই ছয় প্রকার উদ্দেশ্যই পূর্ববর্তী অশ্রেণিবিভক্ত তালিকায় বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য একক ও দলগত ভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের বিকাশ ঘটানো।

6.6.2 পরোক্ষ উদ্দেশ্য (Indirect Objectives)

● একথা প্রথমেই বলা হয়েছে যে পরিবেশ শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। তবুও নিচে কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হল।

● পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ন্যায়নীতি (Ethical) ও সুবিচার বোধের বিকাশ ঘটে। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ হিসাবে মহত্তর মানবিক গুণগুলি মানুষের আচরণের প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে।

● সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ ঘটে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে।

● মানুষের সহনশীলতার বিকাশ পরিবেশ শিক্ষার জ্ঞান ও অংশগ্রহণ জনিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো হয়।

● পরিচ্ছন্নতা বোধ, সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কারণ পরিবেশ ধ্বংস ও অপচয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা ও অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের সম্পর্ক নিবিড়।

● নেতৃত্ব গুণ, দলগত অংশগ্রহণ, যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ, সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রতি নিরাসক্ত মনোভাব পরিবেশ শিক্ষার ও সক্রিয়তার ফসল।

● আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম, অবসরকালীন জীবনের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তি তৈরি করে পরিবেশ শিক্ষা।

6.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞায় মানুষ, তার জৈবিক ও ভৌত পরিমণ্ডল, কৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যেকার জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণগুলি আয়ত্ত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে পরিবেশ শিক্ষার ফলে মানুষ পরিবেশ সহায়ক আচরণগুলি নিজের জন্য স্থির করে নিতে পারবে এবং ঐ আচরণগুলি পালন করার স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করবে। পরিবেশ শিক্ষা কোন সাময়িক শিক্ষা নয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশে সারা জীবন ধরেই পরিবেশ শিক্ষা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। পরিবেশ শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস তৈরির সহায়ক।

প্রাচীন কালের মানুষও যথেষ্ট পরিবেশ সচেতন ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, আচার, রীতি নীতির মধ্যে

পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মানুষের পরিবেশ চেতনা আচার অনুষ্ঠানের তলায় চাপা পড়ে যায় এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষের তখন থেকেই বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আধুনিক পরিবেশ শিক্ষার সূচনা। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও প্রকৃত আন্তর্জাতিক তৎপরতা শুরু হয় 1970 সালের পরবর্তী সময়ে। UNESCO'র উদ্যোগে 1972 সালে স্টকহোমে International Conference on Human Environment অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 1975 সালে বেলগ্রেডে, তারপর ব্যাঙ্ককে একের পর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সম্মেলন ও কর্মশালা থেকে পরিবেশ বিদ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ আলোচনা ও চর্চার শীর্ষে উঠে আসে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার প্রচলন হয়।

পরিবেশ কথাটির অর্থ কোন বিশেষ সময়ে এবং স্থানে মানুষের চারপাশের জৈব, সামাজিক ও ভৌত উপাদানগুলি দ্বারা সৃষ্ট পরিমণ্ডল। আর ইকোলজি কথাটির অর্থ ঐসব উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরতা। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি নির্ভর করে উপরোক্ত দুটির ওপর।

পরিবেশ শিক্ষা একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া যা প্রকৃত পক্ষে বহুবিদ্যার সমন্বয়। পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্যবিষয়, চর্চার ক্ষেত্র এবং শিক্ষক পরিবেশ নিজেই। পরিবেশ শিক্ষা সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত লাভ করা যায় না এবং অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অনেক নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশ শিক্ষার পরিধি হিসাবে এর বিষয় বস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা। প্রাথমিক স্তরে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং পরিবেশ সহায়ক সু অভ্যাস অর্জন করবে। মাধ্যমিক স্তরে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সাহায্যে পরিবেশের উপাদান, পারস্পরিক সম্পর্ক, দূষণ প্রভৃতি পরিবেশের সমস্যাগুলি ও তার প্রতিকার এই সব প্রসঙ্গে জ্ঞান লাভ করবে। প্রয়োজনীয় আচরণ বিধি ও দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করবে এবং ভবিষ্যৎ মূল্যবোধ গঠনের জন্য প্রস্তুত হবে। উচ্চতর শিক্ষায় পরিবেশ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করার লক্ষ্যে পরিবেশ শিক্ষা পরিচালিত হবে। গবেষণার সাহায্যে নতুন জ্ঞান লাভ করা বিচার বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করার শিক্ষাও উচ্চতর পর্যায়ে দিতে হবে। সব কয়টি স্তরের জন্য, পাঠক্রম রচনা করা, উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করা, পদ্ধতি নির্ণয়, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম স্থির করা এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ণয় করাও পরিবেশ শিক্ষার কাজ।

পরিবেশ শিক্ষা বহুবিদ্যার সমন্বিত চর্চা। সেজন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা। শারীরবিদ্যা, গণিত, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, শিক্ষা, রাশিবিজ্ঞান, জনবিদ্যা, জনসংখ্যা বিদ্যা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশ শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও নানা কারণে এর কতগুলি সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। পরিবেশ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প নয়। এর সার্থকতা নির্ভর করে একদিকে শিক্ষকদের উৎসাহ ও উদ্যমের উপর অন্যদিকে পিতামাতা ও বাইরের অন্য মানুষজনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। বাইরের প্রতিকূলতার জন্যও পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। অতিরিক্ত পরীক্ষা নির্ভরতা এবং প্রশাসনিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবেশ শিক্ষার বাধা হতে পারে। সকলের সক্রিয় উদ্যম ছাড়া পরিবেশ শিক্ষা এককভাবে সফল হওয়া কঠিন।

পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষাতেও প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক এবং সঞ্চালনমূলক এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য আছে। পরিবেশ, তার উপাদান, সমস্যা, প্রতিকার বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অর্জন এই গুলি প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য। পরিবেশ সম্বন্ধে আগ্রহ, কৌতূহল, মূল্যবোধ ও প্রতিন্যাসের বিকাশ অনুভবমূলক উদ্দেশ্য। আর পরিবেশ সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করা, তথ্য সংগ্রহ করা, পর্যবেক্ষণের দক্ষতা অর্জন করা তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার দক্ষতা অর্জন করা এইগুলি সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য। UNESCO'র মতে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছয় প্রকার— সচেতনতা, জ্ঞান, প্রতিন্যাস, দক্ষতা, মূল্যায়নের

ক্ষমতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ। এছাড়া কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য আছে। যেমন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার বোধের বিকাশ, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, নেতৃত্বগুণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম ও অবসরকালীন জীবন যাপনের প্রস্তুতি পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত হতে পারে।

6.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) পরিবেশের সংজ্ঞা দিন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষা কাকে বলে?

(গ) পরিবেশ শিক্ষার আন্তর্জাতিক আন্দোলন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

(ঘ) ব্যাঙ্কক সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষাকে বহুবিদ্যার সমন্বয় বলা হয়েছে কেন?

(চ) পরিবেশ শিক্ষাকে জীবন ব্যাপী শিক্ষা বলা হয়েছে কেন?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

(জ) প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধানতম বিষয়বস্তু কি?

(ঝ) পরিবেশ বান্ধব আচরণ বলতে আপনি কি বোঝেন?

(ঞ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের সম্পর্ক কি?

(ট) পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতায় পিতামাতার ভূমিকা কি?

(ঠ) সম্পদের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক কি?

(ড) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ দক্ষতার সম্পর্ক কি?

(ঢ) পরিবেশ শিক্ষা কিভাবে ন্যায়নীতি বোধের বিকাশ ঘটায়?

(ণ) পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার বিকাশ ঘটে কেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিন ও ব্যাখ্যা করুন।

(খ) পরিবেশ ও ইকোতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি?

(গ) প্রাচীন ভারতে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি কেমন ছিল?

(ঘ) ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু কি?

(চ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে জীববিদ্যা ও শারীর বিদ্যার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন ও উদাহরণ দিন।

(ছ) UNESCO নির্ধারিত পরিবেশ শিক্ষার ছয় প্রকার উদ্দেশ্য কি কি?

(জ) পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন।

(ঞ) পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে আচরণ বিধির সম্পর্ক কি? উদাহরণ দিন।

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay type Questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন স্তরে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করে এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা কোথায়; এই সব সীমাবদ্ধতা কিভাবে দূর করা যায়? পরিবেশ শিক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করুন।

একক 7 □ পরিবেশের জন্য উদ্বেগ (Concern for Environment)

গঠন (Structure)

7.1 সূচনা

7.2 উদ্দেশ্য

7.3 পরিবেশের জন্য উদ্বেগ

7.3.1 পরিবেশ দূষণ

7.3.2 সম্পদের অবক্ষয়

7.3.3 জনসংখ্যা বৃদ্ধি

7.4 পরিবেশ ও মানুষ

7.4.1 ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী

7.4.2 মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

7.5 সারসংক্ষেপ

7.6 প্রশ্নাবলি

7.1 সূচনা (Introduction

পরিবেশের সংজ্ঞা ও প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি, পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিচিতি ঘটেছে প্রথম এককে। পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করার পর প্রথম যে প্রশ্নটি মনে আসে তা হল পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের সঠিক বিষয়গুলি কি কি? অর্থাৎ পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সবই অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি পরিবেশের সমস্যাগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করা হয়। কারণ সমস্যাগুলির সমাধান করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারলে পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। আরও সঠিকভাবে বলা যায় পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিতে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে এবং পরিবেশের উন্নয়নকল্পে যে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোথায় অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কি ধরনের কার্যক্রম স্থির করতে হবে, এসবই নির্ভর করছে উপরোক্ত উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করার উপর।

পরিবেশের একটি স্থানিক (Spatial) রূপ আছে। তার একটি পরিবর্তনশীল ও সক্রিয়তার রূপ আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় মানুষ নিজেই পরিবেশ থেকে উৎপন্ন, পরিবেশেরই একটি অংশ বিশেষ। ফলে মানুষের নিজের পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কিত।

সুতরাং মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবেশের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা কঠিন হলেও একান্ত জরুরি। বর্তমান এককে পরিবেশের জন্য আমাদের উদ্বেগের কারণগুলি তুলে ধরাই প্রধান উদ্দেশ্য। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত সূত্রপাত এখান থেকেই।

7.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- পরিবেশ দূষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্পদের ক্রমিক অবক্ষয় সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঐ সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

7.3 পরিবেশের জন্য উদ্বেগ (Concern for Environment)

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে Concern শব্দটির অন্যতম অর্থ হিসাবে দেওয়া হয়েছে worry, trouble, bother ইত্যাদি। এই কথাগুলির মধ্যেই নিচের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। যে পরিবেশে আমাদের সৃষ্টি এবং বেঁচে থাকা, সেই পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের উদ্বেগ বা অশান্তি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয় না। আমাদেরই কৃত কর্মের জন্য উদ্বেগের সৃষ্টি। উদ্বেগের প্রথম কারণ পরিবেশ দূষণ।

7.3.1 পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution)

ল্যাটিন শব্দ Pollutionem কথাটির অর্থ নোংরা করা বা বিকৃত করা। দূষণ শব্দটির বাংলা অর্থ দোষ অর্থাৎ যা বিশুদ্ধ নয় এমন কিছু যুক্ত করা। এই দিক থেকে আক্ষরিক অর্থে পরিবেশ দূষণ বলতে বোঝায় পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব উপাদানগুলির মধ্যে এমন কিছু যুক্ত হওয়া যা ঐ উপাদানগুলির মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় (Pollution means addition of such factors to the physical, chemical and biological components of environment so that the fundamental character of those components)।

দূষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার প্রভাব সুদূর প্রসারী এবং একটি উপাদানের দূষণ অন্যগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। সেজন্য দূষণ ক্রমশ একটি জটিল অবক্ষয় শৃঙ্খলে পরিণত হয়। যে বস্তু বা শক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে পরিবেশের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তাকেও বলা হয় দূষণ (Pollutant)। একবার চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেলে তখন ঐ উপাদানটি দূষিত (Polluted) এই বিশেষণটির সাহায্যে নির্দিষ্ট হয়, যেমন, বায়ু দূষণের ফল দূষিত বায়ু, জলদূষণের ফল দূষিত জল ইত্যাদি।

দূষণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Pollutants) : তিনটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দূষণের শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

—দূষণের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাথমিক দূষণ (Primary Pollutant) এবং গৌণ দূষণ (Secondary Pollutant) এই দুই প্রকার দূষণের কথা বলা হয়। যে বস্তু কোন উৎস থেকে সরাসরি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে নিসৃত হয়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক দূষণ। যেমন, সালফার ডাই অক্সাইড কয়লা বা অনুরূপ জ্বালানি থেকে নির্গত হয়ে বাতাসে মেশে।

আবার ঐ SO_2 যখন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে সালফিউরাস এসিড (H_2SO_3) বা সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) রূপান্তরিত হয় তখন তাকে গৌণ দূষণ বলা হয়। বলা বাহুল্য SO_2 প্রাথমিক দূষণ (সমগ্র রাসায়নিক বিক্রিয়া এখানে অপ্রয়োজনীয়)।

— প্রকৃতির উপাদানগুলির মধ্যে যে অবস্থায় দূষণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় তার ভিত্তিতে পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) এই দুই প্রকার দূষণের কথা বলা হয়। যদি প্রকৃতির স্বাভাবিক কোন উপাদানের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় পরিমাণগত দূষণ। পরিমাণগত দূষণের ফলে স্বাভাবিক উপাদানগুলির অনুপাতের পরিবর্তন হয়। যেমন, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া। মানুষের বিবেচনাহীন আচরণের জন্য যে উপাদান প্রকৃতিতে থাকার কথা নয় তার অস্তিত্ব বেড়ে যাওয়াকে গুণগত দূষণ বলে। যেমন, খাদ্য, মাটি বা জলে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি।

—সবচেয়ে বেশি প্রচলিত শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি হল ইকোতন্ত্র (Ecosystem), এখানে জৈব পরিবর্তনশীল (Biodegradable) এবং জৈব পরিবর্তনরহিত (Non biodegradable) এই দুই প্রকার দূষণের দেখা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক নিয়মে নানা প্রকার জৈব বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে নিসৃত হওয়ার পর তা রাসায়নিক বিক্রিয়া শৃংখলের মাধ্যমে হয় তার মৌলিক উপাদানগুলি প্রকৃতিতে ফিরে আসে অথবা এমন সরলতর যৌগ অণুতে রূপান্তরিত হয় যা পুনরায় অন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই জাতীয় পদার্থকে জৈব পরিবর্তনশীল পদার্থ বলা হয়। স্বাভাবিক পরিমাণে ঐ জাতীয় পদার্থকে দূষণ বলা হয় না। কিন্তু যদি ঐ সব বর্জ্য পদার্থ এত বেশি পরিমাণে প্রকৃতিতে নিসৃত হয় যে তার সবটা পরিবর্তিত হতে পারে না তখন অতিরিক্ত পরিমাণের উপস্থিতি দূষণের কারণ। যেমন, বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের (Carbon Monoxide, CO) উপস্থিতি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে, বাতাসের অক্সিজেনের (Oxygen) সঙ্গে বিক্রিয়ায় তা প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইডে (CO_2) রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে কার্বন বিশ্লিষ্ট হয়ে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় শর্করা (Carbohydrate) উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বাতাসে ফিরে আসে। কিন্ত অত্যন্ত বেশি পরিমাণ কার্বন-মনো-অক্সাইডের উপস্থিতি, উদ্ভিদের অপ্রতুলতা এই দুইয়ে মিলে বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের (Carbon monoxide) পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে সাহায্য করে। তখন তা দূষণ বলে গণ্য হয়।

আবার কিছু কিছু জৈব যৌগ এমন ধরনের যা বদ্ধশৃঙ্খল কার্বন অণু (Closed chain Carbon Molucule) দ্বারা তৈরি। এদের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা এতই সীমিত যে এরা বহু বছর ধরে অবিকৃত অবস্থায় প্রকৃতিকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, প্লাস্টিক, কীটনাশক রাসায়নিক ইত্যাদি। এদের বলা হয় জৈব পরিবর্তনরহিত পদার্থ এবং এই কারণে দূষণ হলে তা জৈব পরিবর্তনরহিত দূষণ হিসাবে পরিচিত হয়।

বায়ুদূষণ (Air Pollution) —বায়ুদূষণের প্রধান কারণ জ্বালানির ব্যবহার। সভ্যতার আদি পর্বে আগুন জ্বালাতে শিখে আগুনকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল মানুষ। সেই থেকে প্রথমে কাঠ পরে জীবাশ্মজাত জ্বালানি (Fossil fuel), যেমন, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য সৃষ্টি হতে থাকল যে, বায়ুতে তাদের অস্তিত্ব বায়ুর স্বাভাবিক চরিত্রকে পরিবর্তিত করে নানা বিপর্যয় ডেকে আনল। এই হল বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের বায়ু দূষণের প্রকৃতি ও পরিমাণ আলাদা হলেও দূষণের কারণগুলি প্রধানত একই।

নিচের সারণিতে বায়ু দূষণের কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

দূষণের কারণ	দূষণের উৎস (জ্বালানি)	বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি
রান্নার জন্য জ্বালানি ব্যবহার	কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি	কার্বন কণা, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি
যানবাহন (মোটর যান, উড়ো জাহাজ, সমূদ্র যান ইত্যাদি)	পেট্রোল, ডিজেল, মবিল ইত্যাদির ব্যবহার।	কার্বন মনো অক্সাইড ও অন্যান্য হাইড্রো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড NO_2, সীসা ইত্যাদি।
তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন	কয়লা	কার্বন কণা, ছাই, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি।
বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, বয়লার ও কল-কারখানার চিমনি	কয়লা	একই, কখনও কখনও হাইড্রোজেন সালফাইড
চাষবাস	ধানচাষ ও সার ব্যবহার (জ্বালানি নয়)	মিথেন গ্যাস
পাথর ভাঙ্গা, খনির উপরি-তলের কাজ	বাতাসে ভাসমান বস্তু কণা	বাতাসে ভাসমান বস্তু কণা

বড় বড় শহরে যানবাহনের সংখ্যা ও অন্যান্য পরিস্থিতির উপর বায়ু দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। ঋতু অনুযায়ী তার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন, শীতকালে বাতাসে ভাসমান কার্বন কণা, ধুলো এবং কার্বন মনো অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে যা ধোঁয়াশা (Smog) নামে পরিচিত। অর্থাৎ কুয়াশা ও ধোঁয়ার মিলিত অবস্থানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে ওঠে। আবার বর্ষাকালে এর পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। কিন্তু বায়ুদূষণের উপরোক্ত কারণগুলি সমস্যাটির একটি দিক মাত্র।

অরণ্য ধ্বংস (Deforestation)—লোক বসতি ও চাষের প্রয়োজনে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন, দারিদ্রের কারণে জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার করতে যেয়ে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation) ধ্বংস করা, ধর্মীয় সংস্কার বশত সৎকার প্রভৃতি কাজে কাঠের ব্যবহার এবং সৌখিনতার দরুন আসবাবের জন্য কাঠের ব্যবহার, এই সব কারণে দ্রুত আমাদের চারপাশের উদ্ভিদের অবনমন ঘটে চলেছে। কার্বন মনোঅক্সাইড উৎপাদনের পাশাপাশি বনাঞ্চল হ্রাসের ফলে বাতাসে CO-এর অনুপাত ক্রমবর্ধমান। যা শেষপর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে ওজোন স্তর (O_3) আছে, যা আমাদের ক্ষতিকর সৌরকিরণ থেকে রক্ষা করে, সেই ওজোন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্রমশ ওজোন স্তরকে ক্ষীণতর করে তুলছে। এর ফলে পৃথিবীর তাপ মাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন, নানা রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। যতটা তাপ পৃথিবীতে শোষিত হচ্ছে তার সবটা CO-এর স্তর ভেদ করে বিকীর্ণ (Radition) হচ্ছে না। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এটাই প্রধান কারণ। এই জন্য ইতিমধ্যেই মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে যা ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের অগ্রিম সূচনা। উপরোক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বর্তমানে বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming)। অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার পরবর্তী প্রভাব মূলত বায়ুদূষণের কারণেই সৃষ্ট।

বায়ুদূষণের অন্যান্য প্রভাবগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে নিচে আর একটি সারণিতে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

দূষণ (Pollutant)	প্রভাব (Effect)
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)	বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়ার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়
কার্বন মনো অক্সাইড (CO)	রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমায় কারণ CO সহজেই হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়।
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) ও ট্রাই অক্সাইড (SO_3)	অ্যাসিড বৃষ্টি, ফসল ও শারীরিক ক্ষতি
ফ্লোরাইড ও ফ্লুরোকার্বন	প্রথমটি উদ্ভিদের ক্ষতি করে, দ্বিতীয়টি রেফ্রিজারেটরে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। এটি ওজোন স্তরে ছিদ্র সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ
নাইট্রোজেন ঘটিত বিভিন্ন অক্সাইড	অ্যাসিড বৃষ্টি। শারীরিক ক্ষতি
হাইড্রোকার্বন, প্রধানত মিথেন (CH_4) ও ইথেন (C_2H_6)	শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা, ফুসফুসের ক্ষতি
ধোঁয়াশা (Smog)	শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষতি। রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ কমে।
তামাকজাত বস্তুর ধোঁয়া	শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষতি। ক্যান্সারের কারণ ও রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ

জল দূষণ (Water Pollution) —জলের সঙ্গে জৈব, অজৈব, দ্রবণীয়, অদ্রবণীয় যে কোন প্রকার এমন কোন বস্তুর উপস্থিতি যদি জলের ব্যবহারযোগ্যতা কমিয়ে দেয় এবং জলের গুণগত মান কমিয়ে দেয় তবে সেই জলকে দূষিত জল বলা হয়। জল দূষণের ফলে অধিকাংশ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়। জল দূষণের প্রধান কারণগুলি হল,

— স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে জলের সঙ্গে মাটি, বালি ইত্যাদি মিশে যায়, যা স্বাভাবিক নিয়মেই থিতিয়ে পড়ে।

— বাড়ি ও গৃহস্থালীর বর্জ্য মিশ্রিত জল। বাড়ির নর্দমা থেকে নির্গত সাবান, কিছু কিছু রাসায়নিক, তৈল জাতীয় বস্তু, ছাই, শারীরিক বর্জ্য এই সব শেষ পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে মূল জলধারার সঙ্গে মিশে যায়।

— কল কারখানার বর্জ্য। কল কারখানা থেকে নানা রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত জল অপরিশোধিত অবস্থায় ভূগর্ভস্থ জলে অথবা উপরিতলের জলের উৎসগুলির সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে। এই বর্জ্যে পারদ, সীসা, তামা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু ও ধাতব যৌগ ছাড়াও অ্যাসিড ও ক্ষার নানাভাবে জীব জগতের ক্ষতি সাধন করে। কিছু কিছু জৈব যৌগ যেমন, ফেনল, ন্যাপথা, সেলুলোজ তন্তু ও অ্যারোমেটিক যৌগও (বদ্ধ কার্বন শৃংখল যুক্ত অণু) দূষণের অন্যতম কারণ।

— কৃষি ক্ষেত্রের দূষণ। প্রধানত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার কৃষি ক্ষেত্রের জলের সঙ্গে মিশে পরে তা মূল জলধারাকে দূষিত করে তোলে। কীটনাশক ছোট ছোট কীট পতঙ্গের পাশাপাশি কৃষি সহায়ক কীট পতঙ্গকেও ধ্বংস করে। পাখি ও অন্যান্য প্রাণিরা খাদ্যের অভাবে অথবা মৃত কীট খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

— স্বাভাবিক জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা কিছু কিছু অন্যান্য শিল্পে প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হয়। এর পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণ গরম জল তারা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয় যা শেষ পর্যন্ত বহু প্রাণির মৃত্যুর কারণ হয় এবং আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তোলে।

সংক্ষেপে, জল দূষণের ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার কয়েকটি হল,

— রোগ জীবাণুর আধিক্য ও স্বাস্থ্যহানি।

— ক্যান্সার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি।

— স্নায়বিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

— পারদ ক্রোমোজোমের বিভাজনে বাধা দেয় এবং জেনেটিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

— শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (লিভার, কিডনি ইত্যাদি) ক্ষতি।

— উদ্ভিদ ও জীব কুলের বিলোপ।

— পাখির ডিমের খোলা নরম হয়ে বংশবৃদ্ধিতে বাধা।

— চর্মরোগ, আর্থারাইটিস প্রভৃতি রোগ।

— উষ্ণায়ন ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা।

● **মৃত্তিকা দূষণ (Soil Polution) —** জল দূষণের কারণগুলি মৃত্তিকা দূষণেরও কারণ। মাটির সঙ্গে নানা রকম বর্জ্য পদার্থ মিশে মাটিকে অ্যাসিড অথবা ক্ষারধর্মী করে তোলা, অবাঞ্ছিত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ঘটানো, জমিকে লবণাক্ত করে তোলা, অথবা মাটিতে এমন ধরনের ধাতব যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি যা উৎপন্ন ফসল, ফলমূল প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের ও প্রাণি দেহে সঞ্চারিত হয়ে বিপদ ডেকে আনে, এই সবই মৃত্তিকা দূষণের পরিণাম। আর এক ধরনের মৃত্তিকা দূষণের ফলে ভূমিক্ষয় ও মাটিতে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের (minerals) অভাব ঘটায়। ভূমিক্ষয় মূলত উদ্ভিদের বিনাশ ও অরণ্য ধ্বংসের দরুন ঘটে আর খনিজ পদার্থের অভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও বংশ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি হয়।

● **শব্দ দূষণ (Sound or Noise Pollution) —** বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রধান অভিশাপ শব্দ দূষণ। মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা ২০ হার্জ (HZ) থেকে ২০০০০ হার্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। শব্দের তীব্রতাকে ডেসিবেল (dB) দ্বারা মাপা হয়। একটু জোরে কথাবার্তা বললে তার তীব্রতার মান হয় ৬০ dB। যখন কোন শব্দ ৮০ dB ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে শব্দদূষণ বলা হয়। ১০০ dB যুক্ত শব্দ অসহ্য মনে হয়।

মানুষ প্রতি নিয়ত শব্দ সৃষ্টি করে চলে। বাড়িতে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি (মিক্সার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি, অনেক লোকের সমবেত চিৎকার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির অত্যন্ত জোরে শব্দ, এই সব শব্দ দূষণের একধরনের কারণ।

লাউড স্পীকার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদের জন্য শব্দ, যেমন রক সঙ্গীত, বাজি পটকার শব্দ ইত্যাদি, শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। পাম্প, ট্রাক্টর, যানবাহন চলাচলের শব্দ (মোটর গাড়ি, বাইক, বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি), খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানো এইগুলিও শব্দ দূষণের কারণ। কল কারখানার যান্ত্রিক শব্দ, গৃহ নির্মাণের শব্দ, পাথর ভাঙ্গার শব্দ, রাস্তা তৈরির রোলার এরকম অসংখ্য শব্দ উৎপাদনের উৎস বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। বিশেষভাবে সমস্যা এই যে মানুষ অপ্রয়োজনে শুধুমাত্র আমোদের জন্য ক্রমাগত নিজের ক্ষতি করেও শব্দ সৃষ্টি করে চলে। শব্দদূষণের প্রভাব অনেক দুর বিস্তৃত।

— শব্দ দূষণ বধিরতার কারণ। বর্তমানে শহরাঞ্চলে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও যেখানে ঘনবসতি বর্তমান, সেখানেও বধিরতার প্রকোপ ক্রমাগত বর্ধমান।

— রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদ্‌স্পন্দনের গতি দ্রুত হওয়া এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি, শব্দ দূষণের অন্যতম ফল।

— মনঃসংযোগে বাধা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা এসব উপসর্গ দীর্ঘকাল যাবৎ শব্দ দূষণের ফলে দেখা যায়।

— কোন কোন ক্ষেত্রে হজমের গোলমাল, পেপটিক অলসার জাতীয় রোগের সঙ্গে শব্দ দূষণের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

— শব্দ দূষণ মানুষের অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও কখনও কখনও উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষই দূষণের কারণগুলি বিস্তারিত জেনে নিয়ে একভাবে নিজের আচরণ ও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে। প্রত্যেকটি দূষণের প্রতিকার ব্যক্তি বা ছোট জনগোষ্ঠীর হাতে নেই। কল কারখানা, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদি থেকে যে দূষণ ঘটে তার নিয়ন্ত্রণ করা একটি রাষ্ট্রের নীতি, আইন, প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও তৎপরতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ উদ্যোগ তুচ্ছ হয়ে যায় না। তার জন্য প্রাথমিকভাবে চাই পরিবেশের জন্য প্রকৃত উদ্বেগ। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ ভাবে ছাত্রছাত্রীরা যে ভূমিকা পালন করতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল।

- বৃক্ষরোপণ ও পালন—ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও পালন করা। যেমন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গাছ লাগানো ও তার যত্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সূচনা করা যেতে পারে।
- বন্য সৃজন আন্দোলন — সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা ও উপযুক্ত নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা।
- কল কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য যাতে সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় তার জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা।
- প্রাণি কুলের রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়া।
- পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হয়ে দূষণের উৎসগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।
- অকারণ শব্দ দূষণ বন্ধ করার উদ্যোগ।
- জৈবসার যুক্ত খাদ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও অভ্যাস গড়ে তোলা।
- অপচয় বন্ধ করা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অকারণে দূষণ জনিত সমস্যা নিরসনের চেষ্টা।
- চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

7.3.2 সম্পদের অবক্ষয় (Depletion of Resources)

জনসংখ্যা শিক্ষায় (Population Education) সম্পদ কি সে সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান মানুষের প্রয়োজনে অর্থাৎ তার চাহিদা মেটানোর জন্য কাজে লাগে তাকেই বলা হয় সম্পদ। অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক উপাদান কোন কাজে লাগে না তাকে সম্পদ বলা চলে না। এখানে চাহিদা পূরণ কথাটি কোন তাৎক্ষণিক অর্থে বলা হয়নি। যে প্রাকৃতিক উপাদান কোন বিশেষ সময়ে চাহিদা পূরণ না করলেও সম্ভাবনাযুক্ত তাকেও সম্পদ বলা হয়। যেমন, খনি থেকে তোলা হয়নি এমন খনিজ বস্তুও সম্পদ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রকৃতিই মানুষের সমস্ত সম্পদের উৎস। মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু সম্পদের রূপান্তর ঘটিয়ে কৃত্রিম সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।

সম্পদের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Resource)

রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদ তিন প্রকার। যথা,

— অজৈব (Inorganic) সম্পদ, যেমন, জল, খনিজ ধাতু ইত্যাদি।

— জৈব (Organic) সম্পদ, যেমন, উদ্ভিদ, প্রাণি, জীবাশ্ম জ্বালানি ইত্যাদি।

— মিশ্র (Mixed), যা একাধারে জৈব ও অজৈব। আমাদের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সম্পদই জৈব এবং অজৈব এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

রাজনৈতিক বিভাগের ভিত্তিতে সম্পদ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

— জাতীয় (National), যেমন, ভূমি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। এগুলিতে একমাত্র অধিকার দেশের সীমারেখার ভিত্তিতে কোন একটি রাষ্ট্রের।

— বহুজাতিক (Multinational), যেমন একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী, হ্রদ, পরিযায়ী প্রাণি ইত্যাদি।

— আন্তর্জাতিক (International), যেমন, বায়ু, সৌরশক্তি, মহাসাগর ইত্যাদি।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বহুল প্রচলিত শ্রেণি বিভাগ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে।

— অসীম বা অফুরন্ত (Inexhaustible) সম্পদ, যেমন, বায়ু শক্তি, সৌরশক্তি, সমুদ্রের ঢেউ থেকে পাওয়া শক্তি ইত্যাদি।

— সীমিত (Exhaustible) সম্পদ। অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদই এই শ্রেণিভুক্ত কারণ এই জাতীয় সম্পদ এক সময় না এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের প্রধানতম ক্ষেত্রটি এখানেই। সীমিত সম্পদ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(ক) পূরণযোগ্য (Renewable) — এই জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করলেও আবার তার পুনরুৎপাদন সম্পদ। কৃষিজ সম্পদ, অরণ্য, গৃহপালিত প্রাণি, খাদ্যের জন্য চাষ করা মাছ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হলেও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে তার পুনরুৎপাদন সম্ভব।

(খ) অপূরণযোগ্য (Non renewable) — এই জাতীয় সম্পদ নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং প্রকৃতিতে সঞ্চিত যে ভাণ্ডার আছে তা ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে কমে যায় এবং একদিন শেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর খনিজ সম্পদ (খনিজ ধাতু সমূহ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) অপূরণযোগ্য সম্পদ। কোন কোন ধাতু এখনই প্রায় নিঃশেষিত। পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয়ও উদ্বেগজনক।

অপূরণযোগ্য সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার হলে সম্পদের পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মেই দ্রুত কমতে থাকে। আবার পূরণযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যয় যদি পুনরুৎপাদনের তুলনায় বেশি হয় তাহলেও সম্পদের ক্রমাগত ঘাটতি হতে থাকে। একেই বলা হয় সম্পদের অবক্ষয় (Depletion of resource), প্রশ্ন হল সম্পদ কিভাবে ব্যয়িত হয় অর্থাৎ কেন সম্পদের অবক্ষয় ঘটে?

শক্তি (Energy) — মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। আবার তার মধ্যে প্রধান হল তাপ শক্তি। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা শরীরে তাপ শক্তি উৎপাদন করে। দেহ সচল রাখার প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক শক্তির জন্যও তাপ দরকার। জ্বালানি হিসাবে বিপুল পরিমাণ কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে তাপশক্তি উৎপাদন করা হয়। বিদ্যুৎ শক্তির জন্যও দরকার জ্বালানির। যানবাহন, কল কারখানা, দৈনন্দিন গৃহস্থালীর প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে অনরবত। তার ফলে একদিকে বাড়ছে দূষণ অন্যদিকে সম্পদের অবক্ষয় তীব্র আকার ধারণ করেছে।

শক্তি উৎপাদনের জন্য যে ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী শক্তি পূরণযোগ্য (Renewable)

এবং অপূরণযোগ্য (Non renewable) এই দুই প্রকার হতে পারে। অরণ্যের কাঠ ও ঝরা পাতা থেকে উৎপন্ন শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এগুলি পূরণযোগ্য। আর কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন শক্তি অপূরণযোগ্য।

শক্তির প্রয়োজনে সম্পদের অবক্ষয় রোধ করার প্রধান উপায় সংরক্ষণ (Conservation)। সংরক্ষণের জন্য তিনটি প্রধান পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে এবং বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

(ক) অপূরণযোগ্য সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে আনা, প্রযুক্তির উন্নতি, অপচয় নিরোধক ব্যবহার বিধি, ভোগ্যপণ্যের যৌথ ব্যবহার, প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে। গৃহস্থালীর কাজে শক্তির অপচয় ঘটে প্রচুর। রন্ধনশৈলীর পরিবর্তন করে অন্ততঃ ৩৫-৪০% জ্বালানি বাঁচানো যায়। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারও অনেকটা কমানো সম্ভব এবং এবিষয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনকারী সংস্থাগুলির উপদেশ মেনে চলা উচিত। তবে বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় ঘটে সে বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(খ) অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার অপ্রচলিত শক্তি (Non-Conventional energy) যা বিকল্প শক্তি হিসাবেও পরিচিত, অর্থাৎ, বায়ু প্রবাহের শক্তি, সমুদ্রের জোয়ারের (Tidal) শক্তি, সৌর শক্তি, পশু বর্জ্য থেকে উৎপন্ন গ্যাসও শক্তি (যেমন, গোবর গ্যাস ও বিদ্যুৎ) ইত্যাদিকে বোঝায়। এই সব শক্তি একদিকে যেমন অফুরন্ত তেমনি পূরণযোগ্য। সবচেয়ে বড় সুবিধা, অপ্রচলিত শক্তি দূষণ মুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব।

(গ) অন্যান্য বিকল্প শক্তির (Other alternative energies) যার কিছুটা ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে, সম্ভাবনাও বিপুল। প্রধান বিকল্পগুলির কয়েকটির নাম দেওয়া হল।

— জল বিদ্যুৎ (Hydroelectricity) আমাদের স্বাধীনতার পর থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের প্রথম জল বিদ্যুৎ প্রকল্প ভাকরা-নাঙ্গাল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রভৃতি রাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

— সৌর শক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে, ফটোভোল্টাইক কোষ ও সিলিকন প্রযুক্তির সাহায্যে বর্তমানে দেশের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

— বায়ুশক্তি, বিশেষত: সমুদ্র বায়ুর সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— পারমাণবিক শক্তি (Nuclear Energy) একটি বিতর্কিত কিন্তু বিপুল শক্তির উৎস। বিতর্কের প্রধান বিষয় পারমাণবিক বর্জ্য ও তার দূষণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জনিত সমস্যা।

— সামুদ্রিক তাপ শক্তির রূপান্তর (Ocean Thermal Energy Conversion) অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রার সঙ্গে গভীর অংশের তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— কৃষিজ শক্তি (Agricultural Energy) কথাটির অর্থ যে সব শ্বেতসার যুক্ত কন্দ থেকে (যেমন, আলু, বীট ইত্যাদি) অ্যালকোহল তৈরি করা যায় সেই সব ফসলের চাষ বাড়িয়ে এবং পেট্রোলের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে জ্বালানির সংরক্ষণ করা। আবার কিছু কিছু উদ্ভিজ্জ তেল (যেমন, Jatropha) পরিশোধিত অবস্থায় পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে শক্তি ও জ্বালানির সাশ্রয় করা যায়।

— জল থেকে হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট করে তাকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে।

ভূমি সম্পদ (Land Resource) — সমুদ্র, নদী, হ্রদ ও অন্যান্য জলাশয় বাদে পৃথিবীর উপরিতলে যে অবশিষ্ট স্থান আছে, তাকে বলা হয় ভূমি সম্পদ। আমাদের দেশের মোট আয়তনের ৪৩% কৃষি জমি, ২৩% বনাঞ্চল, তৃণভূমি ৪% এবং ৮% লোক বসতি। অবশ্য এই অনুপাত ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। ভূমিকে অন্যতম প্রধান সম্পদ বলার কারণ

এই যে মানুষের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ভূপৃষ্ঠের উপরই অনুষ্ঠিত হয়। জমির ব্যবহার প্রণালী অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক দেশই তাদের অধীনস্থ ভূসম্পদ সম্বন্ধে নানা নীতি প্রণয়ন করে জমির ব্যবহার প্রণালী (Land use pattern) নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই সব নীতির মূল কথা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

— অরণ্য অঞ্চলের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখা অথবা সম্ভব হলে বাড়ানো।

— বসবাস ও কলকারখানার জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্ধারিত করা।

— নগরায়ণ ও গ্রামীণ বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

— পরিকল্পিতভাবে কৃষিজমিতে চাষ করা এবং কৃষি জমিকে অন্য প্রকার ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা।

— ভূমির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব তার সম্পদ মূল্যকে কাজে লাগানো।

এই জাতীয় নীতির উপযোগিতা বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ খাদ্য সরবরাহ, কৃষিপণ্য ভিত্তিক অর্থনীতি, অরণ্য সম্পদের সামঞ্জস্য পূর্ণ ব্যবহার, পরিবেশের উন্নয়ন, ইত্যাদি সব কিছুই ভূমি সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন হল ভূমি সম্পদের অবনতি হয় কেন, এবং তার প্রতিকার কি? এখানে কয়েকটি উত্তর তুলে ধরা হল।

(ক) জমির উর্বরতা হ্রাস (Reduction of Social Fertility) — অত্যধিক চাষ, ভুল প্রথায় চাষ, অতিরিক্ত ফলনের আশায় ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার এই সব কারণে জমির স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট হয় এবং তার উর্বরতা হ্রাস পায়। তা ছাড়াও কৃষি জমির কাছাকাছি কলকারখানা থাকলে, দূষিত বর্জ্য, ছাই ইত্যাদি জমির উর্বরতা নষ্ট করে। এর ফলে ক্রমশ জমির উৎপাদন কমতে থাকে। কোন কোন জমি বন্ধ্যা জমিতেও রূপান্তরিত হতে পারে।

এই অবস্থায় প্রতিকার করার অন্যতম উপায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিন্ন ফসলের চাষ (Rotational cropping) করে জমির উর্বরতা বজায় রাখা। জৈব সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে সুতরাং রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। চাষ করার সময় উপর এবং নিচের মাটি বার বার স্থান পরিবর্তন করলে, অনেক সময় উর্বরতা বজায় রাখা সহজ হয়। তাছাড়াও সেচের জন্য ব্যবহৃত জলের গুণগত মান, কাছাকাছি কল কারখানা, তৈল সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠান (যেমন, পেট্রোলিয়াম ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন সম্ভাবনাযুক্ত প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা দরকার।

(খ) ভূমিক্ষয় (Soil erosion) — সাধারণভাবে পাহাড়ের অরণ্য ধ্বংস হলে ক্রমাগত ভূমিক্ষয় হতে থাকে। নদীর ভাঙান, সমুদ্রের বালি উড়ে এসে ক্রমাগত মাটির উপরিতল ঢেকে দিলে, মাটি কেটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভূমিক্ষয় হয়। ভূমিক্ষয়ের বিস্তার, পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার ফলাফল। বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বাদ দিলেও, অনেক সময় মাটির চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায় (যেমন, মৃত্তিকা সরে গিয়ে পাথুরে মাটি বেড়িয়ে পড়া)। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা বৃক্ষরোপণ ও লালন, অরণ্য সংরক্ষণ, নদী পরিকল্পনা ইত্যাদি।

জল সম্পদ (Water Resource) — পৃথিবীর মোট ৭৭% উপরিতল জল এবং বাকি ২৩% স্থলভূমি। কিন্তু মোট জলের বৃহত্তম অংশ মেরু অঞ্চলে, পর্বতশীর্ষে এবং হিমবাহগুলিতে বরফের আকারে সঞ্চিত আছে। মোট জলের ২২.৪% ভূপৃষ্ঠে থাকলেও তার অধিকাংশই সমুদ্রের নোনা জল। সামান্য অংশ (৩.৬%) মাত্র মিষ্টি জলের উৎস। জলের একটি প্রধান সঞ্চয় রয়েছে ভূগর্ভে। এই জল বাষ্পীভূত হয় না, উদ্ভিদও শোষণ করে না কিন্তু মানুষ পাম্প করে তুলে নিতে পারে। জল পূরণযোগ্য সম্পদ কারণ জলের বাষ্পীভবনের ফলে যতটা হ্রাস ঘটে বৃষ্টিপাতের ফলে

তা আবার ফিরে আসে। বৃষ্টি জলের একটা অংশ ভূগর্ভস্থ-জলস্তরে ফিরে যায়। সুতরাং জলের উত্তোলন ও ব্যয় যদি সঞ্চয়ের তুলনায় বেশি হয় তবে ক্রমাগত জলের স্তর নিচে নামতে থাকে এবং নানা বিপর্যয় ডেকে আনে।

জল মানুষের এবং সমস্ত জীবিত প্রাণি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের অপরিহার্য বস্তু। খাদ্যহীন অবস্থায় প্রাণি কয়েকদিন বাঁচলেও জল ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। জলের ব্যবহারের ক্ষেত্র বিরাট ও বিস্তৃত।

— পানীয় জল।

— কৃষিকার্যের জন্য জল।

— কলকারখানার জন্য জল।

— পরিচ্ছন্নতার জন্য জল।

— বিদ্যুৎ উৎপাদন।

— বাসস্থান নির্মাণের জন্য জল।

কৃষিকাজের জন্য জলের বিপুল চাহিদার জন্যই সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আবার নদীর মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু সভ্যতাও ধ্বংস হয়েছে।

জলদূষণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সময় জল নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ কিছুটা বলা হয়েছে। সম্পদ হিসাবে জলের সমস্যাগুলির আরও কয়েকটি এখানে বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক অসাম্য (Natural unevenness) — সারা বছর সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না। যে সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তখন তা ধরে রাখা যায় না, আবার যখন বৃষ্টি হয় না তখন প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় না। অধিক ও স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

— জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন জলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার দরুন মাথাপিছু জলের ব্যবহারও বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। ফলে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিপুল ঘাটতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

— ক্রমগত নগরায়ণের ফলে পানীয় ও অন্যান্য জলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

— খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন এমন বেশি হারে ঘটছে যে প্রায়ই ভূগর্ভস্থ জল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

— জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে এবং জল সম্বন্ধে অবহেলার মনোভাব থাকায় বিপুল পরিমাণ জলের অপচয় ঘটে।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও, নানাভাবে দূষিত হয়ে পড়ায় জল সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় ঘটছে। তার কয়েকটি এখানে আবার উল্লেখ করা হল।

— সমুদ্রের জলে তৈল স্তর সঞ্চিত হয়ে সামুদ্রিক প্রাণিদের অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি করে।

— ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের বিপজ্জনক উপস্থিতি।

— নদীদূষণ বহু নদীর জলকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

— ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় দ্রুত কমে গিয়ে ভূস্তরের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। সমতলে ধস নামার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলের জল নিচু অঞ্চলের ভূস্তরে সরে আসায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

— অপব্যবহারের দরুন ছোট জলাশয়গুলির জল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।

জল সম্পদ রক্ষার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া দরকার তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির ধারণা দেওয়া হল।

— ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সঞ্চয় পরিমাপ করে ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করা এবং শহরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা দরকার।

— বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেওয়া এবং আইন প্রণয়ন করা দরকার।

— কলকারখানা ও শহরাঞ্চলের বর্জ্য জল পরিশোধিত করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এই জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

— যে সমস্ত চাষে জল কম লাগে এমন ধরনের বীজ উৎপাদন করে চাষের রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন। কম জলে ধান চাষ করার কিছু কিছু প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছে।

— সমস্ত রকম অপচয় অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এই বিষয়ে ব্যাপক গণচেতনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে এখনই।

— বনসৃজনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। সেই সঙ্গে উষ্ণায়ন যত কম হবে ততই মেরু অঞ্চলে এবং হিমবাহগুলিতে সঞ্চিত বরফের সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে।

— বাস্তব সম্মত ও কার্যকর নদী পরিকল্পনা (River planning) রচনা করা দরকার। আমাদের দেশে উত্তর ও পূর্বভারতের নদীগুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির সংযোগ সাধন করার একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত ছিল না এবং বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় লাভজনক বলে মনে করা হয়নি।

সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resource) — সমুদ্র অফুরন্ত সম্পদের আকর। সমুদ্র স্রোত, বিশেষভাবে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের গতি ভূমণ্ডলের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে (এল-নিনো বা অনুরূপ প্রভাবের কথা স্মর্তব্য)। সমুদ্র বায়ু যে জলীয় বাষ্প নিয়ে স্থল ভাগে প্রবাহিত হয় তার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর মিষ্টি জলের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখে। নিরক্ষীয় জল বায়ু, ক্রান্তীয় জলবায়ু, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ইত্যাদি বিভাজনগুলির ক্ষেত্রে বায়ু প্রবাহ ও জলকণার উপস্থিতির প্রসঙ্গটি প্রধান। সকল জলবায়ুর ক্ষেত্রেই সমুদ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। যে সমস্ত কারণে সমুদ্রকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়, পূর্ববর্তী অংশগুলিতে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

— **খাদ্যের উৎস (Source of Food)** — সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণি মানুষের খাদ্য হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সবই আয়োডিন যুক্ত খাদ্যের প্রধান উৎস। এছাড়াও সামুদ্রিক উদ্ভিদ (যেমন, কিছু কিছু শৈবাল বা algae) খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

— **ঔষধ (Medicine)** — বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমুদ্রের বহু উদ্ভিদ ও প্রাণি ঔষধের জৈবিক উৎস হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কড, হেরিং প্রভৃতি মাছের তেলকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

— **শক্তির উৎস (Source of Energy)**— সমুদ্রের ঢেউ এবং স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

— পরিবহন (Trans/port) — জাহাজ ইত্যাদি সামুদ্রিক জলযান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। মানুষ ও নানা বস্তুর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্র অপরিহার্য মাধ্যম।

— লবণের উৎস (Source of Salt) — সমুদ্র মানুষ ও প্রাণির লবণের চাহিদা সবটাই মেটায়।

— খনিজ (Mineral)— সমুদ্রের তলদেশের মাটি খনিজ সম্পদে ভরপুর। তবে পেট্রোলিয়াম ছাড়া আর কোন খনিজ উত্তোলন করা হয় না।

— মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতির উৎসও সমুদ্র। এছাড়া সমুদ্র প্রাণি জগতের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সামুদ্রিক সম্পদের অবক্ষয় নানা কারণে ঘটে থাকে।

(ক) নদী বাহিত পলিমাটি সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ চর সৃষ্টি করে এবং নাব্যতা নষ্ট করে। এর ফলে নতুন ভূমি সৃষ্টি হলেও সমুদ্র দূরে সরে যায়, অন্যদিকে উপকূলের ভাঙন ধরে।

(খ) শহর ও শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য পদার্থ, বিশেষত জৈব পরিবর্তনরহিত বর্জ্য পদার্থ, ক্রমাগত সমুদ্র জলকে ভয়াবহ দূষণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তার প্রভাব পড়ছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণি ও সমুদ্রনির্ভর স্থলচর প্রাণি ও পাখিদের উপর।

(গ) একইভাবে বিষাক্ত রাসায়নিক (Toxic chemicals) দূষণ সামুদ্রিক প্রাণিদের ধ্বংসের কারণ।

(ঘ) বন্দর অঞ্চলে, প্রধানত তৈল বন্দর এলাকায়, সমুদ্রের জলে ভাসমান তেলের আস্তরণ থাকায় জলে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে পারে না। এইজন্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায় তাদের উপর নির্ভরশীল প্রাণিকুল লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই সব ক্ষেত্রে প্রতিকার হিসাবে বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন ও নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে জরুরি। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া তেলের আস্তরণ থেকে তেল নিষ্কাশন করার পদ্ধতি উন্নত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের প্রাণি ও উদ্ভিদের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার কারণ তিমি প্রভৃতি বহু জলচর প্রাণির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resource) — সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির জন্য যে সব বিষয়ের অবদান বেশি তার মধ্যে অন্যতম হল ভূগর্ভ থেকে খনিজ ধাতু ও জ্বালানি উত্তোলনের ও নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, তামা, লোহা, সোনা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু ও জ্বালানি মানব সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু আদিম কাল থেকে ক্রমাগত খনিজ পদার্থ তুলে নেওয়ার ফলে, বিশেষত বিগত শতাব্দী থেকে এদের ব্যবহার অপরিমিত হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ খনিজ পদার্থই এখন শেষ হওয়ার মুখে।

কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের মজুত এতই সীমিত যে বিকল্প জ্বালানির উৎস খোঁজা ও তার প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞানীরা দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন। সৌর শক্তি ও অন্যান্য শক্তির কথা ইতিমধ্যেই অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখনও উদ্বেগ নিরসনের কোন সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ধাতুগুলির মধ্যে তামা ও নিকেল প্রায় নিঃশেষিত। তামার অন্যতম প্রধান ব্যবহার ছিল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে। বিকল্প ধাতু হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম, সম্ভবপর ক্ষেত্রে ফাইবার গ্লাসের ব্যবহার ও অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে। গবেষণাও চলছে সারা দুনিয়াময়।

এসব পদক্ষেপ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার।

(ক) অপচয় বন্ধ করা, উত্তোলন ও পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই।

(খ) পরিশোধন ও নিষ্কাশনের সময় উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধাতুর উৎপাদন নিশ্চিত করা।

(গ) ব্যবহারের ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঘ) পুনর্ব্যবহার (Recycling) যত বেশি সম্ভব নিশ্চিত করা।

(ঙ) বিকল্প সন্ধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

অরণ্য সম্পদ (Forest Resource) — অরণ্য সম্পদ কথাটির অর্থ একাধারে উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্পদের সমাহার, সহাবস্থান ও পরস্পর নির্ভরশীলতা মিলিয়ে যে সম্পদ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাই। যদিও অরণ্যের সম্পদমূল্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে তবুও বিষয়টি উল্লেখ করা আবশ্যিক।

— অরণ্য ও সমুদ্র মিলিত ভাবে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের (Biodiversity) ধারক ও প্রতিপালক। উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Flora) এবং প্রাণি বৈচিত্র্য (Fauna) মিলিয়ে জীব বৈচিত্র্য। যেকোন অরণ্যে যত রকমের উদ্ভিদ পরস্পরের সহায়তায় বেঁচে থাকে এবং বংশ বিস্তার করে তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। আবার ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রাণি পর্যন্ত সবই অরণ্যের আশ্রয়ে লালিত হয়।

— আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে অরণ্যের ভূমিকা আজ সকলেরই জানা। বৃষ্টিপাত অরণ্য ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিয়মেই বেশি। পৃথিবী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অরণ্যই প্রধান শক্তি। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global warming) নিয়ন্ত্রণ এক মাত্র অরণ্য সৃজনের সাহায্যেই সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

— বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও অরণ্যই প্রধান। বৃক্ষহীন ঘনবসতি অঞ্চলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ স্বভাবতই বেশি।

— অর্থনীতির দিক থেকে অরণ্য যে কোন দেশের পক্ষে স্তম্ভস্বরূপ। প্রত্যক্ষভাবে, অরণ্য থেকে সংগৃহীত সম্পদ বহুমানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কাঠ, গাছের পাতা, ফুল, ফল, মধু, প্রাণিজ অন্যান্য উপকরণ ছাড়াও ভ্রমণ শিল্প, অরণ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদি অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতির উপর অরণ্যের পরোক্ষ প্রভাবও কম নয়।

কিন্তু অরণ্য সম্পদ ধ্বংস করার ঝোঁকও পাশাপাশি প্রবলভাবে উপস্থিত। এর কারণ

— জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে অরণ্য অঞ্চলে বাসভূমির বিস্তার।

— কৃষির জন্য জমি বাড়াতে গিয়ে অরণ্য দখল।

— অতি লোভে গাছপালা কেটে বিক্রি করা।

— জ্বালানির জন্য গাছ কাটা।

— সৌখিনতার দরুন কাঠের আসবাব, দরজা জানালা ইত্যাদির প্রয়োজনে গাছ কাটা।

— চোরা শিকার করে বন্যপ্রাণি নিধন।

— জল বিদ্যুতের প্রয়োজনে নদী বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করতে যেয়ে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল একযোগে জলের নিচে চলে যাওয়া (এর উদাহরণ—উত্তরা খণ্ডের টিহরি বাঁধ)।

— ভূমিক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হওয়া বন্যা, ধস ইত্যাদির দরুন অরণ্য ধ্বংস হওয়া।

অরণ্য সংরক্ষণ ও বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি করা আজকের পরিবেশবিদদের প্রধান চিন্তার বিষয়। কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা অরণ্য সংরক্ষণের জন্য আশু প্রয়োজন।

(ক) কাঠের ব্যবহার যথা সম্ভব কমানো। আমাদের দেশের গরীব মানুষের প্রধান জ্বালানি বন থেকে সংগৃহীত কাঠ। মৃতদেহ দাহ করার প্রথা ও কুসংস্কারের দরুন প্রচুর কাঠ পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

(খ) কাঠের বিকল্প হিসাবে গৃহনির্মাণে, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহার এখন বহুল প্রচলিত।

(গ) অরণ্য অঞ্চল বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের বন সৃজন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, নাগরিক বনসৃজন (Urban forestry), বিনোদন মূলক বনসৃজন (Entertaining forestry) ইত্যাদি। কিন্তু মূল অরণ্য অঞ্চল যাতে সংকুচিত না হয় এবং তার মৌলিক চরিত্র যাতে না পরিবর্তিত হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(ঘ) এই কাজে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করা দরকার। তৎকালীন উত্তর প্রদেশে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে যে, চীপ্‌কো আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, (১৯৭২-৭৪), অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী। চীপ্‌কো আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং সুন্দরলাল বহুগুণা ও তার সহ আন্দোলনকারীরা অরণ্য সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন, সরকারি পদ্ধতির পরিবর্তন, এবং বহু অবাঞ্ছিত পরিকল্পনা বাতিল করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন।

7.3.3 জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)

জনসংখ্যা শিক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের অবনতির সম্পর্ক অনেকটা আলোচনা করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ। প্রথমে সংক্ষেপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে চলেছে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা দরকার।

● কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি করার দরুন ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, যার পরিণাম সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

● অধিক ফলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে কারণ কম জমিতে বেশি ফসল উৎপাদন না করতে পারলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যাবে না। এর ফলে বেশি করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় মাটির ও জলাভূমির দূষণ ঘটছে। খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণি দেহেও দূষণ ঘটছে।

● ধানচাষের উপজাত বস্তু হিসাবে বাতাসে মিথেন জাতীয় গ্যাসের অনুপাত ক্রমাগত বাড়ছে।

● নতুন বাসস্থান, কল কারখানা স্থাপন করে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করতে যেয়ে আরও বেশি করে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অরণ্যভূমি কমছে এবং উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

● পারিবারিক ও নাগরিক বর্জ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (Waste management) এক বিরাট সমস্যা। বিশেষত এর একটা প্রধান অংশ জৈব পরিবর্তন রহিত দ্রব্য। প্লাস্টিক, যন্ত্রপাতির পরিত্যক্ত অংশ, গাড়ির দূষণ পরিবেশের বিপদ-ডেকে আনছে।

● যে সব ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার দূষণ ছড়ায় তার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে পরিবেশের পক্ষে তা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। ধোঁয়া, শব্দ, ফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি উপজাত বস্তু ভোগ্য পণ্যের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জল সম্পদের ক্ষয় অবধারিতভাবেই যুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জলের প্রয়োজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তার দরুন ভূগর্ভস্থ-জল উত্তোলন বাড়ে। জলস্তর নিচে নেমে গিয়ে নানা বিপর্যয় ডেকে আনে। তাছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, জলের অপচয় এবং দূষণও ক্রমাগত বাড়ে।

● এক কথায় জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পরিবেশের পক্ষে অন্যতম প্রধান বিপদের কারণ।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যার প্রতিকার (**Remedies of Problems related to population growth**)— জনসংখ্যা শিক্ষার শুরুতে বলা হয়েছিল যে জনসংখ্যাকে প্রথম থেকেই আপদ বা সমস্যা হিসাবে দেখা হলেও, পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রথম ধাপ হল শিক্ষা। মানুষ যত বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত হবে ততই তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে এটা প্রায় প্রমাণিত সত্য। পরিবেশ শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটা বিষয়। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত পরিশীলিত পরিবেশ ভাবনা এবং পরিবেশচেতনা আমাদের চারপাশের জগৎকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে শেখায়। তখন পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহজ হয়। অন্যান্য প্রতিকারের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

— প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা সংক্রান্ত এবং জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করা ও কার্যকর করা। এই বিষয়টি স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

— জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিবেশ সংরক্ষিত হয়।

— জনশিক্ষার (Mass education) ভিত্তি সর্বস্তরে প্রসারিত করা দরকার।

— স্বাস্থ্য চেতনার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি।

— দেশে নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো দরকার। এর ফলে তাদের অরণ্য নির্ভরতা কমবে। তাদের অরণ্য সংরক্ষণের তাগিদ বৃদ্ধি পাবে, আসামের মানস অরণ্যে এই পরীক্ষা, অর্থাৎ বন ধ্বংসকারীদের বন সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত করার পরীক্ষা যথেষ্ট সফল হয়েছে।

— পরিবেশ শিক্ষার পাশাপাশি জীবনশৈলীর শিক্ষার (Life style education) একদিকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে।

— স্থিতিশীল বিকাশ (Sustainable development) অর্থাৎ যে ধরনের অর্থনৈতিক, নাগরিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিকাশ পরিবেশ সহায়ক নীতিতে পরিচালিত হয়ে, মানুষ ও সভ্যতার অস্তিত্বকে স্থিতিশীল করে তুলবে, জীব পরিমণ্ডলের ও ভৌত পরিমণ্ডলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই ধরনের বিকাশ সম্বন্ধে নতুনভাবে নীতি প্রণয়ন করে জনসংখ্যা ও বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করলে, কোন নীতিই শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় না।

7.4 পরিবেশ ও মানুষ (Environment and Man)

মানুষের জন্ম, বেঁচে থাকা এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের অস্তিত্ব পরিবেশ নির্ভর সে কথা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কি, সেই বিষয়টি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ তা না হলে মানুষের অস্তিত্ব কতটা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, তার গভীরতা অনুধাবন করা কঠিন। দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সম্পর্ক বিচার করা যেতে পারে— একটি ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী ও অপরটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

7.4.1 ইকোলজির দৃষ্টিভঙ্গী (Ecological Perspective)

পূর্ববর্তী এককে ইকোলজি এবং ইকোতন্ত্রের (Ecosystem) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যার মূল কথা, চারপাশের জগতে যে সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদানগুলি আছে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আদানপ্রদান ও নির্ভরশীলতার স্বরূপই ইকোতন্ত্র। ইকোতন্ত্রের প্রধান দুটি অংশ—জৈবিক (Biotic) এবং অজৈবিক (Abiotic)। কোন একটি বিশেষ দেশ এবং কালে জৈবিক ইকোতন্ত্র এবং অজৈবিক ইকোতন্ত্র পরস্পর যেভাবে সম্পর্কিত, তা একটি গতিশীল (dynamic) অবস্থা। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ইকোতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

ইকোতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem)

—ইকোতন্ত্র ধারাবাহিক ও জটিল কিন্তু তাকে বিচার করা হয়, খণ্ডিত অবস্থায় কোন বিশেষ সময় বা অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে।

— কোন বিশেষ সময়ে এবং অঞ্চলে সমস্ত জৈবিক ও ভৌত উপাদানগুলি ইকোতন্ত্রের অংশীভূত।

— উপাদানগুলির সম্পর্ক একমুখী সরলরৈখিক (Linear) নয়, জটিল ও বহুমুখী।

— ইকোতন্ত্র একটি মুক্ত তন্ত্র (Open system)। যে কোন সময়ে নতুন উপাদানের সংযোগ বা বিলুপ্তি ঘটতে পারে। যেমন, কোন বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণি লোপ পেলে, ইকোতন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

— প্রাকৃতিক ইকোতন্ত্র ছাড়াও কৃত্রিম ইকোতন্ত্র (Artifical) মানুষ সৃষ্টি করে। নগরায়ণ, কৃষি ব্যবস্থা, বাঁধ তৈরি, নতুন রাস্তা— কল কারখানা তৈরির ফলে কৃত্রিম ইকোতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

— ইকোতন্ত্রের নানা প্রকার ভেদ আছে। পরিবেশ শিক্ষার জন্য তার সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro-ecosystem) এবং ক্ষুদ্রতর ইকোতন্ত্র (Micro-ecosystem) এই দুই প্রকার ইকোতন্ত্রের ভিত্তিতে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক বিচার করা হয়।

বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro-ecosystem)

ইকোতন্ত্রের অন্যতম বিষয়, এর উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের শৃঙ্খল। যেমন, খাদ্য শৃঙ্খল, নাইট্রোজেন শৃঙ্খল, ইত্যাদি। জৈবিক ইকোতন্ত্রে তিন প্রকার ভূমিকা শৃঙ্খলের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

— **উৎপাদক (Producer)** অর্থাৎ যে সমস্ত জীব নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে পারে। জীব জগতে প্রধানত উদ্ভিদেরই উৎপাদকের ভূমিকা আছে। তারা জৈব ও অজৈব উপাদানের রূপান্তর ঘটিয়ে, সূর্যালোকের সাহায্যে নিজের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার উৎপাদন করে নেয়।

— **ভোক্তা (Consumer)** অর্থাৎ যে সব প্রাণী নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। উদ্ভিদ ভোজী প্রাণিরা উদ্ভিদ থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ তৈরি করে নেয়। মাংসাশী প্রাণিরা উদ্ভিদভোজী প্রাণির উপর নির্ভর করে। মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণি দুই-ই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ ও উদ্ভিদ এই দুই প্রান্তিক উপাদানের মধ্যবর্তী স্তরে অসংখ্য ছোট ছোট খাদ্য শৃঙ্খল আছে, যে শৃঙ্খলগুলি আবার সামগ্রিকভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

— **পচন কারক (Decomposer)** অর্থাৎ যে সমস্ত জীবাণু, কীট ও অন্যান্য প্রাণি, মৃত বস্তু ও জৈবিক বর্জ্যকে ভেঙ্গে সরলতম প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে ফিরিয়ে দেয়। বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের এটাই মূল কথা, যা নিচের চিত্রটিতে সাংকেতিক ভাবে দেখানো হল।

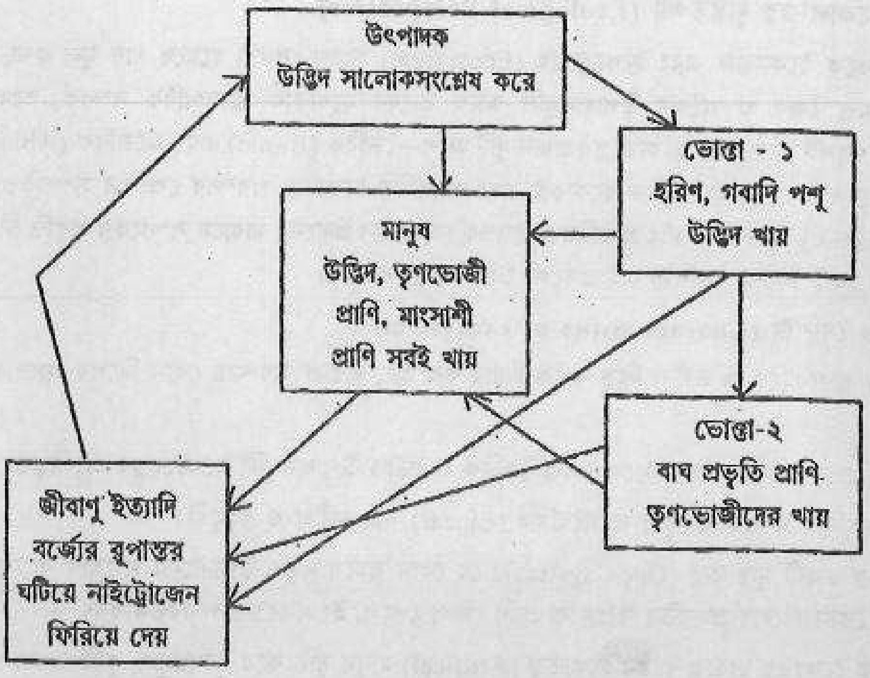

চিত্র : বৃহত্তর ইকোতন্ত্র

মনে রাখতে হবে উপরোক্ত বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের মধ্যে সমস্ত রকম অজৈব উপাদানের কথা বলা হয়নি। উৎপাদকের প্রকৃতি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, ভূপ্রকৃতি, দূষণের পরিমাণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে হিসাবে উল্লিখিত চিত্রটি বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের একটি সরলরূপ মাত্র।

ক্ষুদ্রতর ইকোতন্ত্র (Micro-ecosystem)

পরিবেশের এক একটি অংশে স্বতন্ত্র ইকোতন্ত্রের সৃষ্টি করে। এর প্রধান বিভাগগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

(ক) জল সম্পর্কিত ইকোতন্ত্র (Aquatic ecosystem)

(১) মিষ্টি জল সম্পর্কিত (Fresh water ecosystem)

(২) সমুদ্রজল সম্পর্কিত (Marine acquatic ecosystem)

(খ) ভূতল সম্পর্কিত ইকোতন্ত্র (Terrestrial ecosystem)

(১) মরুভূমি (২) তৃণভূমি

(৩) অরণ্যভূমি (৪) তুন্দ্রা অঞ্চল, ইত্যাদি।

ইকোতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত, যার শীর্ষে আছে মানুষ এবং ভিত্তিতে আছে উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতি। সেজন্য মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেকে বাদ দিয়ে শুধু প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেছে। পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো। অর্থাৎ শীর্ষে অবস্থান করলেও, যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তার শীর্ষে অবস্থান তার অবহেলা অস্তিত্বের সংকট ডেকে নিয়ে আসছে এই কথাটি বোঝা এবং তদনুযায়ী প্রতিকার করা।

7.4.2 মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (Psychological Perspective)

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বোঝানো হয় কয়েকটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের মাধ্যমে, যার কেন্দ্রে আছে মানুষ নিজেই। আমাদের পরিবেশ কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক প্রভাব আলাদা। সুতরাং মানবিক ইকোলজি (Human ecology) এমন একটি আন্তঃসম্পর্কের জাল যা মানুষের আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (Human ecology is such a web of interrelations that influences directly and indirectly human behaviour and in itself is influenced by human behaviour)

Kurt Lewin প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের পরিবেশকে একটি ক্ষেত্র (Field) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষেত্র তত্ত্বের (Field theory) ভিত্তি উপরোক্ত মানবিক ইকোলজি। নিচের চিত্রটিতে বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

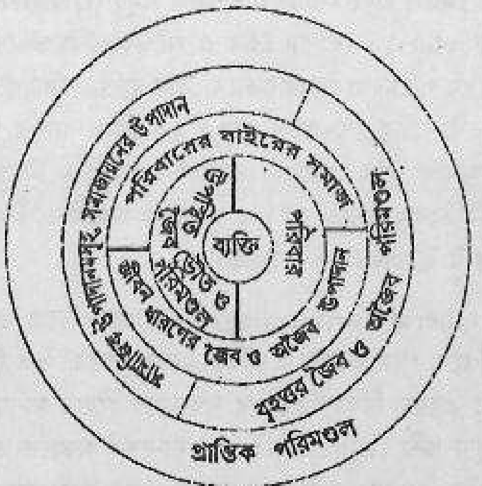

মানবিক ইকোলজির নমুনা চিত্র

চিত্রটিতে পরিবেশের স্তরবিন্যাস দেখানো হয়েছে যার কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি (Individual) — প্রত্যেক মানুষই জন্মের সময় কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় যার কিছুটা জাতিগত (Phylogenetic) অর্থাৎ সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই যা সাধারণ। যেমন, শরীর সংস্থান, শরীর বৃত্তীয় সক্রিয়তা, ইত্যাদি সকলের বেলাতেই একইরকম। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Ontogenetic) অর্থাৎ যা কোন একক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন, বুদ্ধি, গায়ের রঙ ইত্যাদি যা কিছু জিনের মাধ্যমে পিতামাতার বিশেষত্ব অনুযায়ী পাওয়া গেছে। পরিবেশের সঙ্গে প্রাথমিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এগুলিই প্রধান ভিত্তি।

● **উপস্থিত ভৌত ও জৈব পরিমণ্ডল এবং পরিবার (Immediate Physical and Biological Surrounding and Family)**

উপস্থিত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে যে এগুলি নবজাতকের ইন্দ্রিয় গোচর। সে যা দেখতে পায়, শুনতে পায়,

যে তাপ বা শৈত্য অনুভব করে, এবং সেই সঙ্গে যে পারিবারিক বৃত্তে এবং সাহচর্যে তার জীবন শুরু হয়। পরিবারকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে কারণ পরিবারও একই জৈব ও ভৌত পরিমণ্ডলে বাস করে। এই পরিবেশ থেকেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপাদানগুলি আসে।

● জীবন ধারণের জৈব ও অজৈব উপাদান এবং পরিবারের বাইরের সমাজ (**Biological and Physical Factors of living and Society outside Family**) এখানে বলা হয়েছে, যা কিছু উপাদান জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন, তার সবটাই প্রত্যক্ষ গোচর নয় কিন্তু তাদের প্রভাবে জীবন ধারণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে জীবন ধারণ-এর অর্থ শুধু বেঁচে থাকা নয়, জীবন যাপনের এবং জীবন যাপনের গুণমানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু। সেই সঙ্গে পরিবার ও পরিবরের বাইরের মানুষজনও একই উপাদানের সাহায্যে জীবন ধারণ করে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে যার অনেকটাই পরিবারের মাধ্যমে পরিশ্রুত হয়ে আসে।

● বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডল এবং সামাজিক উপাদান সমূহ (**Greater Biological and Physical Environment and Social Factors**) —বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডলকে এক কথায় বলা যায় বৃহত্তর ইকোতন্ত্র (Macro ecosystem)। যে পরিমণ্ডল সামগ্রিকভাবে কোন ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই-ই হল বৃহত্তর ইকোতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার প্রভাব ক্রমশ ব্যক্তির উপরই কার্যকর হয়। সামাজিক উপাদান কথাটির অর্থ যা কিছু সামাজিক বিষয় আমাদের সমাজায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, প্রথা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি যা কিছু মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়, তাকেই বলা হয়েছে সামাজিক উপাদান সমূহ। শিক্ষা, কৃষ্টি ইত্যাদিও এর অন্তর্গত।

● প্রান্তিক পরিমণ্ডল (**Peripheral Surrounding**) — আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক সহজে বোঝা যায় না কিন্তু নানাভাবে ব্যক্তিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক বিষয়, মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপ অথবা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি এরকম বিষয়গুলিও খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) মানুষের অজ্ঞাতে তার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে, তখনই যখন ওজোন স্তরে তা শোষিত হয় না। শোষিত না হওয়ার কারণ গ্রিনহাউস প্রভাব (বৃহত্তর জৈব ও অজৈব পরিমণ্ডল)। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে তার প্রভাব ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়।

বলা বাহুল্য প্রতিটি স্তরেই জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে সামাজিক আচরণের সম্পর্ক আছে। সে জন্য প্রত্যেকটি স্তরকেই দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের উপরোক্ত সম্পর্ক প্রকৃত সম্পর্কের একটি সরল রূপ মাত্র যা থেকে আমরা একটা প্রাথমিক ধারণা পাই। প্রকৃত সম্পর্ক আরও জটিল ও বহুমাত্রিক।

7.5 সার সংক্ষেপ (Summary)

নানা কারণে পরিবেশের জন্য উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বিজ্ঞানী ও বহু সাধারণ মানুষের মনেও তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রধান তিনটি কারণের মধ্যে প্রথমটি পরিবেশ দূষণ। যখন পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে এমন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ঐ উপাদানের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে বলা হয় দূষণ। দূষণকে নানাভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রাথমিক ও গৌণ দূষণ, অথবা গুণগত ও পরিমাণগত দূষণ হয়ে থাকে। কিন্তু

সবচেয়ে বেশি প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ হল, ইকোতন্ত্রের পরিবর্তন যা জৈব পরিবর্তনশীল ও জৈব পরিবর্তনরহিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে বায়ু, ভূমি, জল, এই সবই দূষিত হয়ে থাকে। যানবাহন, কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া, কৃষিকাজের দরুন মিথেনের সৃষ্টি, ভাসমান বস্তু কণা ইত্যাদির দরুন বায়ু দূষিত হয়। মাটির সঙ্গে নানা অজৈব বস্তু মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকা দূষণ হয়। জল দূষণের কারণ কলকারখানার ও গৃহস্থালীর বর্জ্য, কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এছাড়াও নাগরিক জীবনে আছে শব্দ দূষণের অভিশাপ।

পরিবেশের জন্য উদ্বেগের দ্বিতীয় কারণ, সম্পদের অবক্ষয়।। ক্রমাগত ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে সঞ্চিত সম্পদ ক্রমশ কমে আসছে। যে সম্পদ অপূরণযোগ্য তার অনেকটাই নিঃশেষিত হওয়ার মুখে, যেমন খনিজ সম্পদ। আর পূরণযোগ্য সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার চেয়ে ব্যবহারের পরিমাণ বেশি হতে থাকায় তার পরিপূরণ ঘটে না। মানব সভ্যতা শক্তি নির্ভর। শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস জ্বালানি। খনিজ জ্বালানি প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম। শক্তির সংরক্ষণ, বিকল্প শক্তি, অপ্রচলিত শক্তি প্রভৃতির সাহায্যে শক্তির প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা চলেছে। অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ভূমি সম্পদ, জল সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, অরণ্য সম্পদ ও খনিজ সম্পদ সব কিছুরই ক্রমাগত অবক্ষয় ঘটছে। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা অবক্ষয়ের কারণগুলি চিহ্নিত করে সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া এই প্রয়াস সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পরিবেশের জন্য উদ্বেগের তৃতীয় কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের অবনতি ও অবক্ষয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সেজন্য, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া দরকার।

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সহজেই বোঝা যায়। দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমটি ইকোতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী। ইকোতন্ত্রকে অনেকরকম ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। কিন্তু এখানে পরিবেশের মধ্যে মানুষের অবস্থান শীর্ষে বলে মনে করা হয়। পরিবেশের অন্যান্য উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে অবস্থান করে, যার ভিত্তি হল উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতি। অপর দৃষ্টিভঙ্গীটি মনঃতাত্ত্বিক। এতে মানুষের অবস্থান পরিবেশের কেন্দ্রে। তার চারপাশে প্রত্যক্ষগোচর জৈব, ভৌত ও সামাজিক পরিমণ্ডল। সবচেয়ে শেষ স্তরে আছে প্রান্তিক পরিমণ্ডল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক, মহাজাগতিক এই জাতীয় প্রভাব। প্রতিটি স্তরের প্রভাব শেষপর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্তরগুলির মাধ্যমে মানুষে সঞ্চারিত হয়।

7.6 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) পরিবেশের জন্য উদ্বেগ কথাটির অর্থ কি?

(খ) দূষণ কাকে বলে?

(গ) বায়ু দূষণের একটি কারণ লিখুন।

(ঘ) কৃষির দরুন কিভাবে বায়ু দূষণ হতে পারে?

(ঙ) সম্পদ কাকে বলে?

(চ) শক্তিকে সম্পদ বলা হয় কেন?

(ছ) জল সম্পদের অবক্ষয় কেন হয় তার একটি কারণ লিখুন।

(জ) অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের একটি কারণ লিখুন।

(ঝ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্পর্ক কি?

(ঞ) মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক কোন্ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) বায়ু দূষণের কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) মৃত্তিকা দূষণ কিভাবে হয়?

(গ) জল দূষণের প্রতিকার কি?

(ঘ) অপ্রচলিত শক্তি কি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) সামুদ্রিক সম্পদ কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

(চ) খনিজসম্পদের বর্তমান পরিস্থিতি কি?

(ছ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অরণ্য ধ্বংসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(জ) ইকোলজি কাকে বলে ও কয় প্রকার?

(ঝ) ব্যক্তির সঙ্গে তার উপস্থিত ভৌত ও জৈব পরিমণ্ডলের এবং পরিবারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(ঞ) ইকোতন্ত্রে পিরামিড আকৃতির মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) পরিবেশ দূষণ কাকে বলে? পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি ও কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সম্পদের অবক্ষয় কথাটির অর্থ কি? জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদের অবক্ষয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(গ) শক্তি কত প্রকার? পরিবেশের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক কি? শক্তির অবক্ষয় ও তার প্রতিকার আলোচনা করুন।

(ঘ) মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ে একটি রচনা লিখুন।

(ঙ) "জনসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ" —কেন তা ব্যাখ্যা করুন। উদাহরণ দিন। প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মতামত দিন।

একক ৪ □ পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা সমূহ (Agencies of Environmental Education)

গঠন

৪.1 সূচনা

৪.2 উদ্দেশ্য

৪.3 পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা

৪.3.1 প্রথাগত সংস্থা

৪.3.2 প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তর

৪.3.3 প্রথা বহির্ভূত সংস্থা

৪.4 সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

৪.4.1 সরকারি সংস্থা

৪.4.2 বেসরকারি সংস্থা

৪.5 গণমাধ্যম

৪.5.1 সংবাদপত্র

৪.5.2 রেডিও

৪.5.3 ইলেকট্রনিক মাধ্যম

৪.5.4 অন্যান্য মাধ্যম

৪.6 সারসংক্ষেপ

৪.7 প্রশ্নাবলি

৪.1 সূচনা (Introduction)

পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী দুটি এককের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে প্রথম এককে বিশেষভাবে বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে বিদ্যালয়ই পরিবেশ শিক্ষার একমাত্র ক্ষেত্র বা সংস্থা। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরেও বিপুল সংখ্যক মানুষ আছেন যাদেরও পরিবেশ শিক্ষার বাইরে রাখা চলবে না। বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেন। আমাদের মত দেশে এর একটা বড় অংশ কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। আর একটা অংশ স্কুলে পড়া শুরু করেও, নানা স্তরে স্কুল ছুট (Dropout) হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে শিশু শ্রমিকরাও। শিশুশ্রম বিরোধী আইন পাশ হলেও এখনও বিপুল সংখ্যক শিশু অর্থের বিনিময়ে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়, পরিবারেও অর্থ-সাহায্য করে।

অন্যদিকে পরিণত বয়স্ক জনগণের একটা বড় অংশ যারা খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি এবং যারা শিক্ষিত হলেও কোনও রকম পরিবেশ শিক্ষা ছাড়াই নিজেদের প্রথাগত বিদ্যাচর্চা শেষ করেছে। তাদের জন্যও পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সুতরাং সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিদ্যালয়ই পরিবেশ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নয়। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতিও আলাদা। বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয় পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা ও তাদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ধারণা। সেই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

8.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কথাটির অর্থ বলতে পারবেন।
- প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরকারি সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

8.3 পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Environmental Education)

'পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা' কথাটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান (Institution) কথাটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সেজন্য 'সংস্থা' এই নামপদটি যথোপযুক্ত মনে হয়।

যে প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংঘবদ্ধ প্রয়াস অথবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যমুখী প্রচেষ্টা সচেতনভাবে কোনও না কোনও ভাবে জন সাধারণকে পরিবেশ সচেতন করে তোলে ও পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সাহায্য করে তাকেই পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা বলা হয়। (The institute, Organisation, organised effort or similar other goal oriented effort consciously makes people aware of environment and helps in acquiring knowledge, about environment, is called an agency of Environment education)।

এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় পরিবেশ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও একধরনের পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা। অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও সংস্থা আছে। পরিবেশ শিক্ষার সংস্থাগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—প্রথাগত সংস্থা (Formal agencies) এবং প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Non formal agencies) সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার প্রকার ভেদ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে করা হয়, পরিবেশ শিক্ষার বেলাতেও অনেকটা সেই ধরনের। উভয়প্রকার সংস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

8.3.1 প্রথাগত সংস্থা (Formal Agencies)

সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই প্রথাগত শিক্ষা। প্রথাগত সাধারণ শিক্ষার মতই প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থার কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষা কোন একটি কেন্দ্রে বা শাখা কেন্দ্রে পরিচালিত হয়। যেমন, বিদ্যালয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে। সাধারণ শিক্ষার মতই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার মান ক্রমশ উন্নত হতে থাকে।

● প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা, যেমন, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি, বিশেষ প্রশাসনিক নীতি ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

● প্রত্যেকটি স্তরের জন্য সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার আলাদা পাঠক্রম আছে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হয়।

● প্রথাগত শিক্ষার শেষে মূল্যায়ন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও বিশেষ প্রথামত সম্পন্ন হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না।

● পরিবেশ শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষার মতই এক বা একাধিক শিক্ষকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাঠক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তিনিই পরিচালনা করেন।

● প্রথাগত শিক্ষার প্রকরণও পুর্বনির্ধারিত এবং একই প্রকরণ বারংবার ব্যবহৃত হতে পারে।

● প্রথাগত শিক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর একযোগে উপস্থিত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামুলক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই সংস্থার নিয়ম কানুন, রীতিনীতি, নির্দেশ মেনে চলতে হয় এবং শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

এই সব কারণে প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি সুবিধা আছে।

● যেহেতু প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান থাকে না, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষা পরিচালিত হয়। অতএব প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত সাধারণ শিক্ষার সবকয়টি সুবিধাই পাওয়া যায়।

● প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষায় একযোগে বহু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে। অনেক কম সময়ে বহু শিক্ষার্থী পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে।

● এর ফলে ব্যয় কম হয়। পরিবেশ শিক্ষার জন্য আলাদা কোন খরচ দরকার হয় না।

● স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয় না।

● শিক্ষার্থীদের উপর চাপ কম পড়ে।

● প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় এরকম উপকরণগুলি পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।

● দক্ষ শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

● নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা শেষ হয় এবং তার ফলাফল যাচাই করা যায়।

● শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসক প্রত্যেকেই দায়িত্ব নিয়ে যার যার কাজ করে যান। এর ফলে পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতার সম্ভাবনা বাড়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথাগত পরিবশে শিক্ষার কিছু কিছু সমস্যা আছে।

● প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা গৌণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হলে, তা যথেষ্ট গুরুত্ব নাও পেতে পারে।

● প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা কিছুটা গতানুগতিক, যান্ত্রিক নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হতে পারে।

● পরিবেশ শিক্ষাও পরীক্ষা সর্বস্ব হয়ে উঠতে পারে!

● শিক্ষকরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পেলে, পরিবেশ শিক্ষার মান আশানুরূপ না হতে পারে।

● সমস্ত শিক্ষক, প্রশাসক ও অভিভাবক যদি সচেতন না হন, তবে পরিবেশ শিক্ষা তাদের কাছে বোঝা স্বরূপ মনে হতে পারে।

● শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে বসে শিক্ষকের মুখ থেকে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। তারজন্য যে সক্রিয়তা ও পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ দরকার তার অভাব ঘটলে পরিবেশ শিক্ষার আর কোন সার্থকতা থাকে না।

কিন্তু এই সব সমস্যা থাকলেও প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক স্তরে যত আলোচনা হয়েছে বা উদ্যম নেওয়া হয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যই বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে।

8.3.2 প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তর (Levels of Formal Environmental Education)

প্রাথমিক স্তর (Primary Level) : পরিবেশ শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া উচিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুদের সার্বিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি করা। অর্থাৎ তাদের দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশের জন্য প্রথম বাল্যকালের (Early Childhood) স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলি সঠিকভাবে যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করা। সক্রিয়তা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। যে সমস্ত সঞ্চালনমূলক, প্রজ্ঞামূলক ও সামাজিক দক্ষতা (Skill) পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ সেগুলি আয়ত্ত করে প্রাথমিক স্তরে। পড়া, লেখা, গণিতের চারটি মৌলিক প্রক্রিয়া (Fundamental operations) এই পর্যায়েই শেখা হয়। সেই সঙ্গে আত্ম নির্ভরতার শিক্ষাও প্রাথমিক স্তরে শুরু হয়। মাতৃভাষা, প্রকৃতি পরিচয়, স্বাস্থ্যবিধি, গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সমাজ পরিচিতি, মূলত এই পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। যদিও আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার দরুন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শেখানো বাধ্যতামূলক, কিন্তু তার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যাইহোক, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়, সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার ভিতরেই প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে।

যে সমস্ত প্রসঙ্গ প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ও কাজে লাগানো দরকার, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

● পরিবেশ কথাটির সঙ্গে পরিচিতি প্রাথমিক স্তরে হওয়া দরকার। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের পঠন পাঠন ও সক্রিয়তার ক্ষেত্রে পরিবেশ শব্দটির ব্যবহার ও তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি হওয়া দরকার।

● চারপাশের প্রাণি ও উদ্ভিদ, অর্থাৎ গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল, ফুল-ফলের গাছ, কৃষিক্ষেত্রের গাছ, গৃহপালিত পশু, কীট পতঙ্গ, যা কিছু তার প্রত্যক্ষগোচর সেগুলি সম্বন্ধে কৌতুহল ও প্রাথমিক ধারণা জন্মানো দরকার।

● পর্যবেক্ষণে উৎসাহ দিলে, শিশুদের কৌতুহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতে তা প্রকৃতি প্রেমে পরিণত হতে পারে।

● চারপাশের মানুষ, বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তি, তাদের কাজকর্ম, জীবন চর্চা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করা প্রাথমিক স্তরেই সম্ভব।

● স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ রোগ ব্যধির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা, পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতা, এগুলি সবই পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। এইগুলির প্রাথমিক শিক্ষাও ভবিষ্যত পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

● খেলাধূলা, শরীর চর্চার সম্বন্ধে শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। সুতরাং খেলাধুলার সময় পরিবেশের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক শিশুদের বোধগম্য ভাষায় তুলা ধরা দরকার।

● গ্রামাঞ্চলে মধ্যাহ্নকালীন আহারের জন্য খাদ্য রান্না করা, পরিবেশন, পরিচ্ছন্নতা এই সবই পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এককথায় প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করা দরকার কারণ এই ভিত্তি যে দৃঢ় বুনিয়াদ তৈরি করে, তা সারা জীবন স্থায়ী হয়। আমরা অনেক শিক্ষাই ভুলে যাই কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শেখা বিষয়, যেমন, লেখা, পড়া, অঙ্কের সাধারণ নিয়ম এসব আমরা কোনদিনও ভুলি না। এমন কি প্রাথমিক স্তরে শেখা ছড়া, কবিতা অনেকেরই সারাজীবন মনে থাকে।

মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage) — মাধ্যমিক স্তরে প্রাথমিক স্তরে শুরু হওয়া পরিবেশ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা দরকার। মাধ্যমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে সক্রিয়তা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদির গুরুত্ব যথেষ্ট থাকলেও লেখা পড়া অনেকটা বিষয় নির্ভর হয়ে ওঠে। মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এই সব বিষয় সমগ্র মাধ্যমিক স্তরেই পড়ানো হয়। এই সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরে যে সব পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব দেখে বা স্পর্শ করে বোঝা যায় না, উদ্ভিদের পাতায় প্রস্বেদন ঘটে তা সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে তথ্য সংগ্রহের, তথ্য বিশ্লেষণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, ইন্দ্রিয় পরীক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে নানাভাবে সম্ভব। জ্ঞান একমুখী বা একমাত্রিক নয়, এখন জ্ঞান বহুমুখী ও বহু মাত্রিক।

পরিবেশের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্তরে যে পরিবেশ ছিল প্রত্যক্ষগোচর মাধ্যমিক স্তরে সেই পরিবেশই দেখা দেয় বহু রূপে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরেই প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার শুরু। আরও একটি কারণে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। এই স্তরের শিক্ষার কাঠামো প্রায় সর্বজনীন। বিষয়বস্তু, পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপাদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও, মূলত তা সর্বত্র একই। এই কারণে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মৌলিক ধারণাগুলি শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষাদানের অন্যান্য সুবিধাগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

● কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক কৌতুহল, উদ্যম, উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সহজেই তাদের পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশকর্মী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

● মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলি যুক্ত করা সম্ভব। এর ফলে তাদের পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করা যেমন সহজ হবে তেমনি অনায়াসে পরিবেশ সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ হবে।

● মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতানুগতিক সহপাঠক্রমিক কাজগুলির পরিবর্তে পরিবেশ সম্পর্কিত সহপাঠক্রমিক কাজের প্রবর্তন করলে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

● বিমূর্ত চিন্তায় সক্ষম মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তাদের চারপাশের পরিবেশকে বুঝতে চেষ্টা করবে, এর ফলে শুধুমাত্র তথ্য নয় পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক তারা অনুধাবন করতে পারবে এবং নিজেদের আচরণ সেই মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

● তারা অন্যদের স্বমতে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে পারবে এবং নিজের শিক্ষা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের ক্ষেত্রে আর একটি সুবিধা এই যে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রবণতা বেশি, দলের প্রতি আনুগত্য (Group conformity) এই সময়ে সর্বাধিক। সেজন্য দলগত দায়িত্ব দিলে এরা অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে থাকেন। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি হল দলবদ্ধভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ। সেদিক থেকেও মাধ্যমিক স্তরের উপযোগিতা সর্বাধিক।

মাধ্যমিক স্তরে বা পরবর্তী স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে পরবর্তী একটি এককে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এখানে মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার সমস্যা (Problems of Environmental Education in Secondary Stage)

মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি অনতিক্রম্য নয়। তবে তার জন্য সমস্যাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

● মাধ্যমিক স্তর বিশেষভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে সাধারণত উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশ পথ বলে মনে করা হয়। এই স্তরে উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সর্বাধিক। সেজন্য, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক সকলেই পাঠক্রমের সেই অংশগুলির উপর জোর দিয়ে থাকেন যা তাঁর পরবর্তী শিক্ষার পথ সুগম করবে বলে মনে করেন। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষা তাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব না পেতে পারে।

● মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন পাঠক্রম (Core Curriculum) অনুযায়ী পাঠ পরিচালিত হয় কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি স্বতন্ত্র শাখায় ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষা যদি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য না হয় অর্থাৎ যদি পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় তবে একই স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় আলাদা হতে পারে।

● মাধ্যমিক স্তর পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কিন্তু গ্রাম, শহর, মহানগর প্রভৃতি বাসস্থান এলাকাগুলির পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ভিন্ন রকম হওয়ায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীর একই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়। ফলে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পরিবেশ শিক্ষার একটি অভিন্ন পাঠক্রম নির্বাচন করা কঠিন।

● অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা মাধ্যমিক স্তরে কার্যকর পরিবেশ শিক্ষাদানের একটি প্রধান অন্তরায়।

● যথাযথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ছাড়া এই জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং গুণগত মান এখনও যথেষ্ট উন্নত নয়। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি যুক্ত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর (College and University Stage)

নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে সম্প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়ানো শুরু হয়েছে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণও বাধ্যতামূলক হয়েছে। সেইরকম কলেজ স্তরেও পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত শাখাতেই পাঠ্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় অথবা বলা যায় কিছুটা অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শুধুমাত্র পরিবেশ বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলিতে পরিবেশ শিক্ষার কোন আয়োজন নেই।

পরিবেশ শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হিসাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধান কার্যক্রম হওয়া উচিত পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার গবেষণায় জোর দেওয়া। সেজন্য কলেজ স্তরে পরিবেশ ও তার সমস্যার সঠিক চরিত্র অনুধাবন করার প্রসঙ্গটিতে জোর দেওয়া এবং সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করার পূর্বে এই স্তরে যে সমস্ত বিদ্যাচর্চার শাখা পরিবেশ সংক্রান্ত পাঠ ও গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেগুলি উল্লেখ করা দরকার।

ভাষা ও সাহিত্য (Language and Literature) — সমস্ত সাহিত্যেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ক বহু উচ্ছাস রচনা আছে। ঐগুলির মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক সান্নিধ্য তৈরি হতে পারে।

রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা (Physics and Chemistry)—পরিবেশের ভৌত উপাদানগুলি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের জীবনযাত্রা ও আচরণের সঙ্গে ভৌত উপাদানগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এই সব বিষয় চর্চা করার সর্বোত্তম মাধ্যম রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। বিশেষভাবে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry), পদার্থবিদ্যার তাপ (Heat), আলোক (Light), শব্দ (Sound) ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা উল্লেখযোগ্য।

জীব বিদ্যা (Biology) — প্রাণিবিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany), শরীরবৃত্তীয় বিদ্যা (Physiology) বা তাদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা পরিবেশ বিদ্যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এইগুলির মাধ্যমেও পরিবেশের জৈবিক উপাদান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ চর্চা হওয়া দরকার।

সমাজ বিদ্যা (Social Sciences) — সমাজবিদ্যাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)। পরিবেশের সমস্ত উপাদান, তাদের পরির্বতন, ব্যবহার, ইত্যাদি শেষপর্যন্ত মানুষের আচরণের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত। পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের আচরণে পরিবেশবান্ধব বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা। সমাজবিজ্ঞানও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার, তাদের বিবর্তন, উৎস ও প্রভাব এমনি অসংখ্য বিষয় পরিবেশ ও তার সংরক্ষণের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে সক্ষম। নৃতত্ত্ব বিদ্যাও (Anthropology) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূবিদ্যা (Earth Sciences)—ভূগোল (Geography) ও ভূ-বিজ্ঞান (Geology) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আঞ্চলিক ভূগোল থেকে শুরু করে আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমির প্রকৃতি, ভূস্তরের উপাদান, ক্ষয়, খনিজ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় পরিবেশ শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। মানচিত্রবিদ্যা (Cartography) পরিবেশ চর্চার আর একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার।

ইতিহাস (History) ও পুরাতত্ত্ব (Archeology)— ইতিহাস অতীত সভ্যতার উত্থান পতন ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ যে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্বন্ধে তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রধান উৎস। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব থেকে বর্তমান মানুষ তার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পেতে পারে এবং সে হিসাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে পরোক্ষ হলেও ইতিহাসের ভূমিকা নগণ্য নয়।

অন্যান্য বিদ্যা (Other disciplines)— এছাড়াও গণিত, জৈব প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমুদ্রবিদ্যা, ইত্যাদি এমন কোন বিষয় নেই যা কোনও না কোন ভাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারে।

পেশাবিষয়ক বিদ্যা (Professional Disciplines)—উচ্চতর শিক্ষার একটি বড় অংশ পেশাবিষয়ক বিদ্যাচর্চা করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Sciences)। চিকিৎসা বিদ্যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শরীর ও মনের ক্রিয়াকলাপ, রোগ-ব্যাধি, তাদের কারণ ও নিরাময় নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছে। একজন চিকিৎসকের অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয় কোন্ শারীরিক বিপর্যয় কোন্ পরিবেশে

কিভাবে ঘটে, কেন ঘটে। সুতরাং একজন চিকিৎসকের পক্ষে যেমন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনি-চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিবেশ শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে চলেছে। প্রযুক্তির (Technology) নানা শাখাতেও পরিবেশ চর্চা অপরিহার্য। বস্তুতঃ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশ বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান গবেষণার বিষয় (যেমন, রেফ্রিজারেটার, অটোমোবাইল প্রভৃতি প্রযুক্তির পরিবর্তন)। এই প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা বিদ্যার (Management Science) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এই সব বিষয়ের বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তরে যে ভিত্তি তৈরি হয় তাকে প্রকৃত ফলপ্রসূ করার স্থান উচ্চতর শিক্ষা।

8.3.3 প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Nonformal Agencies)

প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে আছে বৃহত্তর ও বিপুল সংখ্যক জনতা যাদের ক্ষেত্রেও পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে আছে নানা ধরনের মানুষ। যেমন, (ক) যারা কখনও প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায়নি, (খ) যারা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেও নানা কারণে অল্পকাল পরেই ছেড়ে দিয়েছে, (গ) যারা অনেক কাল পূর্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে ইত্যাদি। পরিবেশ সংক্রান্ত কোন প্রথাগত জ্ঞান লাভ করা এদের কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই সব মানুষকে পরিবেশ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখলে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এই সব মানুষের জন্য পরিবেশ শিক্ষার আয়োজক যে কোন প্রতিষ্ঠানই প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গণ্য হতে পারে। এরকম সম্ভাব্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

প্রথাগত সংস্থার প্রথাবহির্ভূত ভূমিকা (Nonformal Role of Formal Agencies)—প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি তাদের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে, প্রতিষ্ঠানের বাইরের মানুষকে পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশবান্ধব আচরণে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারি সাহায্য ও অনুদান নির্ভর জাতীয় সেবা প্রকল্পের (National Service Scheme বা NSS) কথা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকল্পের অন্তর্গত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও তার লালন পালনকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখায় সাহায্য করা। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় এই সব কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নিয়ম রক্ষায় পর্যবসিত হয়। সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে এই জাতীয় প্রকল্প প্রথাবহির্ভূত পরিবেশ শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও, বিদ্যালয়গুলি যে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অবস্থান, সেই অঞ্চলের মানুষকে পরিবেশ সচেতন করার দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু কিছু বিদ্যালয় এই জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেও এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ মাধ্যমটি এখও পর্যন্ত প্রায় অব্যবহার্যই থেকে গেছে।

অন্যান্য প্রথা বহির্ভূত সংস্থা (Other Nonformal Agencies)—প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কিছু কিছু প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির (Adult Education Centre) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করে তোলার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পারিবারিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পরিবেশ সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। এর ফলে বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ জনতা পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। এর জন্য কোন স্বতন্ত্র পাঠক্রমের প্রয়োজন নেই। গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশ ও সমস্যাগুলির মধ্যে থেকেই পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলি বেছে নেওয়া যায়।

এই ধরনের আর একটি সংস্থা হয়ে উঠতে পারে গ্রাম সভাগুলি। গ্রাম সভায় সমবেত গ্রামবাসীরাও একইভাবে নিজেদের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে উদ্যোগী হলে, এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও তথ্য পেলে পরিবেশ শিক্ষায় নিজেদের স্ব-শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। মনে রাখতে হবে গ্রামীণ জীবন যাত্রায়, পুরনো ঐতিহ্য এবং অন্যান্য প্রথার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বহু উপাদান স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘকাল যাবৎ নিহিত আছে। সেই গুলিকে চিহ্নিত করে নিয়ে এবং অবাঞ্ছিত আচরণগুলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে, পরিবেশ শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লোকশিল্প, লোক সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠান রীতি নীতির কথাও উল্লেখ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে ভাদু, টুসু, ঝুমুর ইত্যাদি উৎসব ও গান অনেক সময়ই লোক শিক্ষার উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। গ্রামীণ মেলাগুলিও এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক একটি মেলায় লক্ষাধিক পর্যন্ত জনসমাগম হওয়ায় একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করে তুলে পরিবেশ রক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা যায়।

উপরোক্ত সংস্থাগুলি উদাহরণ মাত্র। এই ধরনের আরও সংস্থা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

8.4 সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা (Role of Government and Non Government Agencies)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষার উদ্যোগ শুরু হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ মুক্তির প্রসঙ্গে নানা প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। সরকারি সংস্থা হিসাবে প্রধান কয়েকটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হল।

8.4.1 সরকারি সংস্থা (Government Agencies)

পরিবেশ দপ্তর (Department of Environment)

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সভায় একজন করে পরিবেশ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বলাবাহুল্য তাঁদের জন্য স্বতন্ত্রদপ্তর ও ব্যয়বরাদ্দও নির্দিষ্ট করা হয়। এই দপ্তরগুলি সর্বভারতীয় স্তরে অথবা রাজ্য স্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল,

- পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ।
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনা গঠন।
- পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
- শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় পরিবেশ শিক্ষার বিস্তার ও স্থায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ করা।
- প্রচার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা সরাসরি পরিবেশ শিক্ষার আয়োজনের সহায়ক। এই দিক থেকে সরকারি পরিবেশ দপ্তরকে পরিবেশ শিক্ষার প্রথা বহির্ভূত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। ব্যাপক গণ শিক্ষার আয়োজন করা ছাড়াও, পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গবেষণা, গবেষণায় উৎসাহ ও আর্থিক অনুদান, বিভিন্ন আলোচনা সভা,

প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি আয়োজন করে সরকারি পরিবেশ দপ্তর পরিবেশ শিক্ষার গ্রহণ বহির্ভূত সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (Autonomous Bodies Receiving Govt. Grant)—জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (N.C.E.R.T.), জাতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষৎ (Indian Council for Social Science Research), জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন ও পরিকল্পনা সংস্থা (National Institute of Educational Planning and Administration) প্রভৃতি সংস্থাগুলি স্বশাসিত হলেও সম্পূর্ণভাবে সরকারি অনুদান নির্ভর। এইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সরকারি কর্মচারির প্রাপ্তব্য সমস্তরকম সুযোগ সুবিধাই পেয়ে থাকেন এবং সংস্থাগুলি মোটামুটি সরকারি নীতিতেই পরিচালিত হয়। সেজন্য এই সব প্রতিষ্ঠানকে সরকারি সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। প্রধানত স্বাধীন গবেষণা সংস্থা হওয়ায় এদের কাজ প্রধানত গবেষণা ও প্রশিক্ষণমূলক। সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এদের গবেষণালব্ধ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষার জন্য গবেষণা, গবেষণায় উৎসাহ দান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য পুস্তক প্রণয়ন, অন্যান্য উপকরণ তৈরি করা, সমীক্ষা পরিচালনা করা, আঞ্চলিক ক্ষেত্র উপদেষ্টা (Field Adviser) মারফৎ সারা দেশে বিশেষজ্ঞ পরিষেবা দান ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে N.C.E.R.T. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

8.4.2 বেসরকারি সংস্থা (Non Government Agencies)

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক নজরদারি, পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি (N.G.O.) যতটা তৎপর, প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ততটাই সীমিত। বিশেষভাবে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে বিকাশ (Development) এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তারজন্য জীবন যাত্রা প্রণালীতে কি ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, ইত্যাদি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলিতে অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা নগণ্য।

তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও অনেক সমাজসেবা মূলক বা সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান (Social Welfare Organization) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি অনেক সময়ই বছরের কয়েকটি দিন পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন, বিশ্ব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচার ও পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করা, তহবিল সংগ্রহ, বনমহোৎসব পালন, সাফাই অভিযান প্রভৃতি কাজের উদ্যোক্তা বিদ্যালয় ছাড়াও বহু সমিতি, ক্লাব, সমাজসেবী সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নানাভাবে পরিবেশ শিক্ষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

তবে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষায় সকলকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই প্রধান।

8.5 গণমাধ্যম (Massmedia)

পরিবেশ শিক্ষার প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গণ্য না হলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সব মাধ্যমগুলিকে পরিবেশ শিক্ষার প্রথাগত বা

প্রথাবহির্ভূত কোন প্রকার সংস্থাই বলা যায় না কারণ গণমাধ্যমের নানা বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মকাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সচেতনভাবে পরিবেশ শিক্ষাদান এদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরিবেশ বিষয়ক তথ্য, সমস্যা, নীতি, ইত্যাদি প্রচার করার ক্ষেত্রে এই সব গণ্য মাধ্যমের বিশেষ কিছু সুবিধা আছে। যেমন,

- অত্যন্ত সহজে নিয়মিত তথ্য প্রচার করতে পারে।
- তথ্য গ্রাহক জনসাধারণ সামান্য ব্যয়ে অথবা প্রায় বিনা ব্যয়ে তথ্য পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য তাঁদের কোন স্বতন্ত্র ব্যয় করতে হয় না।
- এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌছে যেতে পারে।
- বিনোদনের মাধ্যমেও অনেক কিছু শেখা বা জানা যায়।
- বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে।
- অধিকাংশ মানুষের কাছে গণ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।
- খুব সহজেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে দিতে পারে। এই বিতর্কে জনসাধারণও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের মতামত তৈরি করে নিতে পারে।

বিশেষ কয়েকটি গণমাধ্যম সম্বন্ধে সংক্ষেপে ও স্বতন্ত্রভাবে নিচে উল্লেখ করা হল।

8.5.1 সংবাদপত্র (Newspaper)

সাধারণ সংবাদপত্র দৈনিক প্রকাশিত হয়। কোন কোন সংবাদপত্র সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক হলেও তাদের মুল উদ্দেশ্য সংবাদ পরিবেশন নয়। সংবাদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। দৈনিক সংবাদ পত্রগুলি পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে তার মধ্যে আছে,

- পরিবেশ বিষয়ক যে কোন সংবাদ পরিবেশন।
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ।
- নিজেদের সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
- পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য (যেমন, কোন বড় শহরের বাতাসে প্রতিদিনকার ধূলিকণার পরিমাণ, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা, সালফার ডাই অক্সাইডের মাত্রা ইত্যাদি) প্রকাশ।
- সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করা ও পর্যালোচনা করা।
- চিঠিপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ।
- কখনও কখনও জনমত গঠনের প্রয়াস।
- পরিবেশ সংক্রান্ত দাবি উত্থাপন।

সংবাদপত্রের সুবিধা এই যে, এই মাধ্যম ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত সবার ঘরেই সহজে পৌছে যায় এবং তাদের পরিবেশিত সংবাদ ও তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সবার কাছেই অত্যন্ত বেশি।

8.5.2 রেডিও (Radio)

এক সময়ে রেডিও ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়, ব্যাপক ও গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যম। বর্তমানে রেডিও প্রধানত বিনোদনের

মাধ্যম হলেও গ্রামাঞ্চলে, বিশেষভাবে যে সব সুদুর অঞ্চলে সংবাদ পত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি সহজলভ্য নয়, সেই সব অঞ্চলে এখনও রেডিওর গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লি মঙ্গালের আসর, পল্লি কথা, কৃষিকথার আসর জাতীয় প্রোগ্রামগুলি শোনার আগ্রহে, এবং প্রতিদিনকার খবর শোনার জন্য গ্রামাঞ্চলে বহুলোকের একস্থানে জড়ো হওয়ার দৃশ্য খুব বিরল ছিল না। এইসব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিওর ভূমিকা সংবাদপত্রের চেয়েও ব্যাপক হতে পারে। এর সুবিধাগুলি উল্লেখ করলেই এই কথা সহজে প্রতীয়মান হবে।

- রেডিও নানা আকৃতির হয়, অধিকাংশ সময়ই পকেটে নিয়ে বেড়ানো যায়।
- যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় রেডিও শোনা যায়। এমনকি অন্ধকারেও রেডিও শোনায় কোন সমস্যা নেই।
- একবার রেডিও কিনলে মাঝে মাঝে ব্যাটারি পরিবর্তন ছাড়া আর কোন খরচ নেই।
- একজন রেডিও শুনলে আশেপাশে সবাই শুনতে পায়। সংবাদপত্রের মত একবারে একজন নয়, একবারে অনেকে শুনতে পায়। এমনকি অনিচ্ছুক হলেও কানে যায়।
- রেডিওতে বিনোদন ও শিক্ষা এক সঙ্গে হতে পারে।
- একই কথা বারে বারে নানাভাবে প্রচার করা যায়। এরফলে কোন তথ্য জানতে না চাইলেও জানা হয়ে যায়।

এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে রেডিও অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

8.5.3 ইলেকট্রনিক মাধ্যম (Electronic media)

প্রধানতম ইলেকট্রনিক মাধ্যম অতি অবশ্যই টেলিভিশন। টেলিভিশন প্রায় প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন অত্যন্ত শক্তিশালী বিনোদন ও গণমাধ্যম। শ্রবণ ও দৃশ্য দুটি সংবেদন প্রক্রিয়া একযোগে ব্যবহৃত হওয়ায় টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অসাধারণ। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন ঘটনা, তথ্য বা দৃশ্য সরাসরি তৎক্ষণাৎ টেলিভিশনে দেখানো হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতামত, তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ টেলিভিশনে সহজলভ্য। এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা গণমাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।

এই সব কারণে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশন সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা নিতে পারে। টেলিভিশনের উপরোক্ত সুবিধাগুলি ছাড়াও আরও কিছু সুবিধা আছে। যেমন,

- রেডিওর মত এক সঙ্গে অনেকে দেখতে পারে।
- রঙীন দৃশ্য আকর্ষণীয় ও সঠিক চেহারায় ঘটনাকে তুলে ধরতে পারে।
- অসংখ্য চ্যানেল ও নানা বিচিত্র ধরনের চ্যানেল থাকায় প্রতিটি চ্যানেলেই কিছু কিছু পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া যেতে পারে।
- ব্যয়বহুল হলেও বিনোদনমূলক আকর্ষণের জন্য অনেকেই এই ব্যয় করে থাকেন এবং অক্ষমদের দেখার সুযোগ দিয়ে থাকেন।
- বিদ্যুৎ ছাড়াও আজকাল সৌরশক্তি বা অন্য অপ্রচলিত শক্তির সাহায্যে টেলিভিশন দেখা সম্ভব।

একথা মনে রাখা দরকার, টেলিভিশন সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলেও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের মাধ্যম মোবাইল ফোন (Cell phone) এখন একাধারে টেলিফোন,

টেলিভিশন ও কম্পিউটারের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। যদিও অধিকাংশ সুবিধা এখনও বেশির ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে। তা হলেও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বিপুল।

শহরের মানুষ এবং গ্রামের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল কম্পিউটার নির্ভর অন্তর্জাল (Internet) ব্যবস্থা। বিশ্বজোড়া অন্তর্জালের (www) মাধ্যমে যে কোন তথ্য যে কোনও সময়ে পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত ব্লগ পদ্ধতিও শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব মাধ্যমের সবকিছুই সদর্থকভাবে ব্যবহার করতে হবে। নেতিবাচক মাধ্যম হিসাবে এরা যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতাও রাখে। এই সব মাধ্যম কতটা পরিবেশবান্ধব ভূমিকা নেবে তা নির্ভর করে সদিচ্ছা, সততা ও নিষ্ঠার উপর।

8.5.4 অন্যান্য মাধ্যম (Other Media)

প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য। প্রচারভিত্তিক, বিনোদন ভিত্তিক, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভিত্তিক অসংখ্য মাধ্যম পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় কিন্তু পরোক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল, তা নমুনা মাত্র।

সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি।

সঙ্গীত— গণসঙ্গীত, লোক সঙ্গীত ইত্যাদি।

অভিনয়— যাত্রা, নাটক, একক অভিনয়, পথনাটিকা ইত্যাদি।

আঞ্চলিক— প্রথা, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

চিত্রকলা—পোষ্টার, পটশিল্প, দেওয়াল চিত্র, অলঙ্করণ ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র— পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, ডকুমেন্টারি, প্রচারচিত্র ইত্যাদি।

8.6 সার সংক্ষেপ (Summary)

কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংঘবদ্ধ প্রয়াস যখন সচেতনভাবে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন করে তখন তাকে বলা হয় পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা। পরিবেশ শিক্ষার দুই প্রকার সংস্থা আছে— প্রথাগত সংস্থা এবং প্রথা বহির্ভূত সংস্থা। প্রথাগত শিক্ষার যে সব প্রতিষ্ঠান আছে যেমন, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি, সেগুলিই প্রথাগত সংস্থা। কারণ, এই সব প্রতিষ্ঠানে, এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, পরিকল্পিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষকরা শিক্ষাদান করেন। প্রথাগত শিক্ষার সমস্তরকম সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। তাই বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন স্বতন্ত্র আয়োজন দরকার হয় না। তবে সেই সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার সমস্যাগুলিও এক্ষেত্রে বর্তমান।

প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার মতই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রাথমিক স্তরে সরাসরি পরিবেশ শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই স্তরে শুধু মাত্র পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিবেশের পরিচিতি ঘটানো হয়। মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি তৈরি হয়। কারণ এখানে নানা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা তেমনি তার কার্যকারণ সম্পর্কগুলিও বুঝতে শেখে। তাদের স্বাভাবিক কৌতুহল, শিক্ষা ক্ষমতা প্রভৃতি এক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষাকে সার্থক করে তোলে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষাকে আরও গভীরতর করে তোলা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে পরিবেশের নানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত

হয়। এছাড়াও আছে পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা করে নতুন বিষয় জানার প্রক্রিয়া যা উচ্চতম স্তরেই সম্ভব। পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আর এক ধরনের পেশাগত সংস্থা।

প্রথা বহির্ভূত সংস্থা মূলত যারা প্রথাগত সংস্থার প্রথাগত শিক্ষার আওতায় নেই সেই সব মানুষের জন্য প্রথাগত সংস্থাগুলিও কিছু কিছু প্রথাবর্হিভূত শিক্ষার আয়োজন করে থাকে। প্রথাবহির্ভূত সংস্থা বিপুল ও বিচিত্র। সরকারি পরিবেশ দপ্তর, সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রথাবহির্ভূত সংস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এছাড়াও আছে নানা রকম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গণ মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এদের মধ্যে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রধান। প্রত্যেকটিরই পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক মাধ্যম ও চলচ্চিত্র প্রধান।

৪.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions).

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কাকে বলে?

(খ) প্রথাগত সংস্থা কথাটির অর্থ কি?

(গ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থার দুটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার স্তরগুলি কি কি?

(ঙ) মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি নির্মিত হয় কেন?

(চ) প্রথাগত সংস্থাগুলি কোন ক্ষেত্রে প্রথা বহির্ভূত ভূমিকা নিতে পারে?

(ছ) গণমাধ্যম হিসাবে রেডিও ও সংবাদপত্রের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ব্যাপক?

(জ) গণ মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন আকর্ষণীয় কেন?

(ঝ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠানের ভূমিকা কি?

(ঞ) ইন্টারনেট পরিবেশ শিক্ষায় কি ভূমিকা নিতে পারে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত?

(খ) মাধ্যমিক স্তরে কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়?

(গ) সাহিত্য ও ইতিহাস কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার বাহন হতে পারে?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়গুলির ভূমিকা কি?

(ঙ) পেশা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন থাকবে?

(চ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থা কাকে বলে? পরিবেশ শিক্ষায় পরিবেশ দপ্তরের ভূমিকা কি?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় এন. সি. ই. আর টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি?

(জ) পরিবেশ শিক্ষায় রেডিও কি ভূমিকা নেয়?

(ঝ) গণমাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রের সুবিধা কি?

(ঞ) প্রচলিত গণমাধ্যমগুলি ছাড়া অন্যান্য গণমাধ্যমগুলির পরিচয় দিন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা কাকে বলে? প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থাগুলি ও তাদের ভূমিকা বিশদ আলোচনা করুন।

(খ) প্রথা বহির্ভূত সংস্থা কাদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার কাজ করে? সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির পরিচয় দিন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

একক 9 ❑ পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এবং ধারা (Curriculum and Approaches of Environmental Education)

গঠন

9.1 সূচনা

9.2 উদ্দেশ্য

9.3 পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতি

  9.3.1 পাঠক্রমের সমন্বয়

  9.3.2 পাঠক্রমের সম্প্রসারণ

  9.3.3 আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি

  9.3.4 পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য

  9.3.5 পাঠক্রম রচনার অন্যান্য নীতি

9.4 পাঠক্রমের বিষয়বস্তু

  9.4.1 প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তু

  9.4.2 মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তু

  9.4.3 উচ্চতর স্তরের বিষয়বস্তু

9.5 পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি

  9.5.1 গতানুগতিক পদ্ধতি

  9.5.2 আধুনিক পদ্ধতি

  9.5.3 অন্যান্য পদ্ধতি

9.6 পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিখন

9.7 সারসংক্ষেপ

9.8 প্রশ্নাবলি

9.1 সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী এককে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংস্থা কিভাবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারকম ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রথাগত পরিবেশ শিক্ষার সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সম্ভাব্য পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা এই প্রসঙ্গে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মত একটি বাধ্যতামূলক আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখলে প্রথম যে প্রশ্নটি মনে আসে সেটি হল পরিবেশ শিক্ষার

পাঠক্রম কি হবে এবং তার অন্তর্গত বিষয়বস্তুই বা কি হবে। শুধু তাই নয় যে কোন পাঠক্রমের সার্থকতা তাকে পঠন পাঠনের মাধ্যমে কার্যকর করে তোলার মধ্যে দিয়ে। সেজন্য এই প্রশ্নও অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে যে পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতিই বা কেমন হবে।

বর্তমান এককে এই বিষয়গুলিই সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। প্রথমেই দেখতে হবে বিদ্যালয় বা উচ্চতর স্তরে পরিবেশ শিক্ষার স্থান কোথায় থাকবে। সেজন্য পাঠক্রম রচনার নীতি পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যগুলি স্থির করে নেওয়া দরকার। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়বস্তু ও শিক্ষণের প্রসঙ্গ আসবে।

9.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা,

- পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির ভালো মন্দ বিচার করতে পারবেন।
- পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

9.3 পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতি (Principles of Environmental Education Curriculum)

পরিবেশ শিক্ষা অথবা অনুরূপ যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা বর্তমান সময় ও সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সেগুলির পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতিগত সমস্যা দেখা দেয়। যে কোন বিষয়ের পাঠক্রমের ক্ষেত্রেই এই নীতিগত প্রশ্নগুলি আছে কারণ পাঠক্রম রচনার প্রথম ধাপটিই হল, কোন্ নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা করা হবে সেটি স্থির করে নেওয়া। এখানে নীতি কথাটির অর্থ দিক্ নির্দেশক বা অভিমুখ (approach) বিষয়ক নীতি। নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা করা না হলে তা উদ্দেশ্যহীন ও খাপছাড়া হতে বাধ্য।

9.3.1 পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum)

যে কোন পাঠক্রম রচনার একটি সর্বজন গ্রাহ্য নীতি হল পাঠক্রমের সমন্বয়। এই নীতির প্রধান কথা, সমগ্র পাঠক্রমটিকে সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য, ধারাবাহিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার করে সংগঠিত ও আবশ্যিক ধারণা সৃষ্টি করার উপযোগী পাঠক্রম রচনা করা। এই জাতীয় পাঠক্রমের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। সমন্বিত পাঠক্রমে (Integrated curriculum) মনে করা হয়, জ্ঞান শুধুমাত্র বহু বিচ্ছিন্ন তথ্যের যোগফল মাত্র নয়। জ্ঞান একটি সংগঠিত সদা পরিবর্তনশীল, সক্রিয় একক।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের ক্ষেত্রে সমন্বয় কথাটির অর্থ, অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় পাঠ্য হিসাবে ইতিমধ্যেই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার উপাদানগুলিকে সমন্বিত করা। যেমন, উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ (Photosynthesis) সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়াবার সময় বনসৃজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত

করা, অথবা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রসঙ্গটি পড়ানোর সময় নদীর জল দূষিত হলে মানুষের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করা, ইত্যাদি।

সমন্বিত পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য—

- এখানে বিষয়বস্তুর কোন গণ্ডী রাখা হয় না। যে কোন বিষয়ের সঙ্গে যেকোন বিষয়ের যৌক্তিক, বিষয় বস্তুগত বা অন্য কোন সম্বন্ধ থাকলেই তাদের সমন্বিত করা যায়।
- শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো হয়।
- শিক্ষক জ্ঞানের সমন্বয়কারী হিসাবে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন তথ্য সরবরাহ করেন না, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ও বিচারবোধকে উদ্দীপিত করতে চেষ্টা করেন।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সুবিধা হল,—

- শিক্ষার্থীদের কখনই মনে হয় না তারা অতিরিক্ত একটি বিষয় পড়তে বাধ্য হচ্ছে।
- পরিবেশের সমস্যাগুলি অনুধাবন করার জন্য তাদের নিজস্ব বিচারবোধ পরিশীলিত হয়।
- শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত বিষয় পড়ানোর চাপ থাকে না।
- শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে ক্রমাগত বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনই একঘেয়ে মনে হয় না।
- শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী সংহত জ্ঞান লাভ করে যা সারা জীবন স্থায়ী হয়।
- তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়ে।

এর দুই একটি অসুবিধাও আছে। যেমন,—

- অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটালে অনেক সময়ই পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি গৌণ হয়ে পড়ে। তার কার্যকর কোন প্রভাব বাস্তবে দেখা যায় না।
- শিক্ষক যথেষ্ট তৎপর এবং জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ (Resourceful) না হলে সমন্বয়ের উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।
- সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
- বুদ্ধিমান, সাধারণ বা দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের বেলায় সমন্বয় প্রক্রিয়ার প্রভাব আলাদা হতে পারে।
- মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করার সময় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু যথেষ্ট গুরুত্ব না পেতে পারে।

এই সব কারণে পাঠক্রম সমন্বয়ের নীতি শেষপর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ বলে গণ্য হয়।

9.3.2 পাঠক্রমের সম্প্রসারণ (Expansion of Curriculum)

এই নীতি সমন্বয় নীতির বিপরীত। সমন্বয়ের বেলায় যেখানে পাঠক্রমের সংকোচন ঘটে, এই নীতির ফলে পাঠক্রম প্রসারিত হয়, অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা নতুন বিষয় হিসাবে পাঠক্রমে স্থান করে নেয়। পাঠক্রমের সম্প্রসারণ দুই ভাবে হতে পারে। একটিতে সরাসরি 'পরিবেশ শিক্ষা' নামে পাঠক্রমে একটি অতিরিক্ত পত্র যুক্ত করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুটি আলাদা করে পড়ে, পরীক্ষা দেয়। তার জন্য আলাদা বই, শিক্ষক এবং সময় নির্দিষ্ট থাকে। আর একটিতে স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসাবে যুক্ত না করে বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক অংশগুলি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ হিসাবে ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির পাঠক্রমে জুড়ে দেওয়া হয় এবং কিছুটা সমন্বয় সাধনও করা হয়। এর

ন্য আলাদা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক বা সময় দরকার হয় না ঠিকই তবে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে প্রতিটি অংশ পাঠ করে।

পাঠক্রম সম্প্রসারণের সুবিধা হল,—

- স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি পড়ে।
- আলাদা সময় ও শিক্ষক নিয়োজিত হলে, শিক্ষার্থীরা ক্রমশ একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে পরিবেশ শিক্ষা পেতে পারে।
- সমন্বয় ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংযোগ পরিবেশ শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রেখেও করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে প্রকৃতই পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠে।

সুবিধাজনক হলেও, এর অসুবিধাও কম নয়,

- ছাত্রছাত্রীদের উপর নতুন বিষয়ের বোঝা বাড়ে, তাদের পরিশ্রমও বাড়ে।
- আর একটি পরীক্ষা সর্বস্ব নতুন বিষয়ে পরিণত হয়ে পরিবেশ শিক্ষা তার গুরুত্ব হারায়।
- নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা অনেক সময়ই আর্থিক কারণে ও উপযুক্ত লোকাভাবে সম্ভব হয় না। তখন পরিবেশ শিক্ষা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষায় পরিণত হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।
- পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃত পরিবেশ নির্ভর না হয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর হয়ে পড়ে।

এই সব কারণে পাঠক্রমের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নীতিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে বর্তমানে অনেক দেশে এবং অনেক স্তরে পরিবেশ শিক্ষার জন্য সম্প্রসারণ নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

9.3.3 আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি (Horizontal and Vertical Principle)

প্রকৃত অর্থে কথাটি আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের নীতি। সাধারণভাবে পাঠক্রমের আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের প্রসঙ্গটি প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আলোচিত হয়ে থাকে। পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে আনুভূমিক সম্প্রসারণ কথাটির অর্থ কোন একটি স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, বয়স ও শিখন ক্ষমতাকে অতিক্রম না করে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সব তথ্য তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জানতে আগ্রহী তার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন করা। প্রত্যেক বয়সের শিশুরই তার চার পাশের জগৎ সম্বন্ধে তীব্র কৌতূহল থাকে, সে জানতে চায়, বুঝতে চায় বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক। স্কুল পাঠ্য বিষয় তার কৌতূহলকে কিছুটা নিরসন করতে পারে কিন্তু তা আংশিকমাত্র। সেজন্য পাঠক্রমের পরিকল্পনা এমনভাবে করা সম্ভব যে সমন্বয় বা সম্প্রসারণ যাই হোক না কেন তা তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক হবে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু স্কুলপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক, এই নীতি অনুযায়ী কখনই শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত মনে হয় না।

অন্যদিকে, উল্লম্ব সম্প্রসারণ নীতির অর্থ, পাঠ্য বিষয়কে সব সময়ই কিছুটা অগ্রগামী রাখা। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সবসময়ই কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। এর স্বপক্ষে যুক্তি এই যে পাঠক্রম যদি বিকাশধারাকে অনুসরণ করে তবে কখনই বিকাশ প্রক্রিয়ার বাঁধা পথের বাইরে অগ্রগতি ঘটবে না। সেজন্য স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপেক্ষা না করে তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি অনুযায়ী মনে করা হয়, শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল ও আগ্রহের উপর নির্ভর না করে তার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার উপযোগী পাঠক্রম তৈরি করা দরকার। পরিবেশের মধ্যে নানা পরিবর্তন,

অসঙ্গতি, ইত্যাদির প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তার মধ্যে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞাত তথ্যের বা ঘটনার প্রতি তার আগ্রহ ও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে হবে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের নীতি দুই-ই যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। সেজন্য, এই দুই প্রকার সম্প্রসারণের একটিকে অপরটির বিকল্প মনে করলে ভুল হবে। বরং উভয় নীতির সম্মিলিত প্রয়োগ পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমকে বেশি কার্যকর করে তুলতে পারবে বলে মনে হয়।

9.3.4 পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য (Objectives of Curriculum)

সাধারণভাবে পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষা তথা শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণিবিন্যাস বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। তবে পরিবেশ শিক্ষা বিশারদরা স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি নির্বাচিত উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। সে হিসাবে নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

সচেতনতা (Awareness)—শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের মধ্যে পরিবেশ ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, পরিবেশের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা তৈরি করা, দলগত কাজ ও একক আচরণকে পরিবেশ বান্ধব করে তোলার জন্য চেতনা জাগ্রত করা, পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের উদ্দেশ্য।

জ্ঞান (Knowledge) — সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধীয় নানা বিচিত্র তথ্য জানা, বোঝা (Understanding), বিশ্লেষণ (Analysis), জ্ঞান প্রয়োগ করা (Application), সংশ্লেষণ (Synthesis), মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদির উদ্দেশ্যে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি হওয়া দরকার।

প্রতিন্যাস (Attitude) — পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এমন হওয়া দরকার যা সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্বন্ধে ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে তুলবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। শিক্ষার অনুভব বর্গের উদ্দেশ্য (Affective domains of Educational objectives) এই বিষয়টিকেই স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করেছে, যার চূড়ান্ত পর্যায় হল চরিত্রায়ন (Characterisation)।

দক্ষতা (Skill) — পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য, পরিবেশ বান্ধব আচরণের জন্য এমনকি পরিবেশ শিক্ষা আয়ত্ত করার জন্য যে সমস্ত বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এখানে সেগুলির কথাই বলা হয়েছে। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম শুধুমাত্র প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) ও অনুভবমূলক (Affective) উদ্দেশ্যভিত্তিক হবে না, প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি অর্জন করার সমান সুযোগ সেখানে থাকা দরকার।

এক কথায় সাধারণ শিক্ষার মতই পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যও একই রকমভাবে তিনটি বর্গে বিভক্ত এবং পাঠক্রমে তার যথাযথ প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

9.3.5 পাঠক্রমের অন্যান্য নীতি (Other Principles of Curriculum)

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার আরও কয়েকটি নীতি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই নীতিগুলিকে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার প্রত্যক্ষ নির্দেশমূলক নীতি **(Direct guiding principle)** বলা হয়।

- পরিবেশকে তার স্বাভাবিক, কৃত্রিম, প্রযুক্তিমূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, নান্দনিক ইত্যাদি যত প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায়, তার সামগ্রিক একটি স্বরূপ হিসাবে বিচার করতে হবে এবং উপযুক্ত স্তরে উপযুক্ত বিষয় স্থান দিতে হবে।

● পরিবেশ শিক্ষাকে ধারাবাহিক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসাবে বিচার করতে হবে, প্রথাগত বা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যাই হোক না কেন।

● পরিবেশ শিক্ষাকে একটি আন্তর্বিদ্যা (Interdisciplinary) চর্চার বিষয় হিসাবে দেখতে হবে।

● পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশি (বিষয়টি পরে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে; দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য দ্রষ্টব্য)।

● পরিবেশের সমস্ত সমস্যা ও বিষয়বস্তুকে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

● বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম সেইভাবে রচিত হওয়া দরকার।

● পরিবেশের জটিল রূপ ও সমস্যার জটিলতার রূপ এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বিকাশ হয়।

● পারস্পরিক সহযোগিতা, মূল্যবোধ, পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাঠক্রমে থাকা দরকার।

● বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ থেকে শেখার আয়োজন পাঠক্রমে থাকা চাই।

● পরিবেশকে জানার এবং বোঝার, সমস্যাগুলি অনুধাবন করে তার প্রতিকার নির্ণয় করার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বকীয় ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

● শিক্ষার্থীরা যাতে পরিকল্পনা তৈরি করা, পরিকল্পনার ভালোমন্দ বিচার করা এবং পরিকল্পনা কার্যকর করার দক্ষতা আয়ত্ত করে সেটাও দেখা দরকার।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাপী কর্মসূচি যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন, অবসর বিনোদন, আনন্দ উৎসব সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবে।

9.4 পাঠক্রমের বিষয়বস্তু (Contents of Curriculum)

পূর্বোক্ত নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিন্যাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি উদ্দেশ্যগুলি ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। সেজন্য শিক্ষার্থীদের বয়স ও শিক্ষার স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস হওয়ার প্রয়োজন। এখানে প্রধানত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষার সম্ভাব্য পাঠ্যসূচির ধারণা দেওয়া হয়েছে।

9.4.1 প্রাথমিক স্তরের বিষয়বস্তু (Contents of Primary Level)

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি খুবই সুনির্দিষ্ট। এর মধ্যে আছে—

— মাতৃভাষায় পড়ার দক্ষতা অর্জন করা।

— মাতৃভাষায় লেখার দক্ষতা অর্জন করা।

— সংখ্যা, গণনা, সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা অর্জন।

— পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিচিতি। এর মধ্যে সামাজিক ও জৈব পরিবেশও আছে।

— স্বাস্থ্যবিধি, সাধারণ রোগ ব্যাধি, শরীর চর্চা, খেলাধূলা ইত্যাদি সম্বন্ধে কার্যকর জ্ঞান।

— স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা অর্জন।

— দেশের অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা।

— সৃজনশীলতার বিকাশ, সুস্থ বিনোদন ও সক্রিয়তার আনন্দ।

এই সব উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে এবং অনেকটাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানোর্জনের মাধ্যমে শেখানো হয়। এর সব কয়টিই কোনও না কোন ভাবে পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সাহিত্য — সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু গল্প বা ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ (যেমন, সেকালের গোপাল ভট্টাচার্য বা জগদানন্দ রায়ের লেখা), ছড়া, কবিতা ইত্যাদি সংযোজন করা যায়, যেগুলি চারপাশের গাছপালা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে ছোটদের কৌতূহলী করে তুলবে এবং পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করবে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য কিছুমাত্র কম থাকবে না।

গণিত— দৈনন্দিন জীবনে পাটীগণিতের প্রয়োগ, অর্থাৎ গণনা, শ্রেণি বিভাগ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি যথেষ্ট কাজে লাগানো যেতে পারে। গণিতের সমস্যাগুলির মধ্যে চারপাশের প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে গৃহীত অনেক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র টাকা পয়সা, ক্রয় বিক্রয়, অবান্তর পরিমাপের সমস্যা না দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের যাতে সমস্যা তৈরি করা, সমস্যার অনুসন্ধান করা ও তার সমাধান করার কাজে নিয়োজিত করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতি বিজ্ঞান — প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সরাসরি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। এখানে এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা দরকার যা বই পড়ার থেকে বেশি চারপাশের জগৎ পর্যবেক্ষণ করে, নমুনা সংগ্রহ করে, হাতে কলমে পরীক্ষা করে শেখা যায়। পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, নোটবুক তৈরি করা, নিজেদের মধ্যে আলোচনা, আদান প্রদান করার জন্য সুযোগ থাকলে, শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই তার প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করবে এবং ভালোবাসতে শিখবে।

ভূগোল— স্থানীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, কৃষি সম্পদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় (যেমন, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি) ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা ও তার সহজবোধ্য কারণ ব্যাখ্যা করা এই সব বিষয় সরাসরি পরিবেশ পর্যবেক্ষণে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান — একইভাবে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে ধারণা গঠনে উৎসাহিত করা যায়। সাধারণ রোগ, তার প্রতিকার, পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা, এরকম অনেক বিষয় পরিবেশ শিক্ষার খুব ভালো বাহন হয়ে উঠতে পারে।

ইতিহাস— ইতিহাসের গল্প, দেশের নানা মনীষীদের পরিচিতি, অতীতের বিখ্যাত কোন ঘটনা, সবকিছু থেকেই পরিবেশ শিক্ষার পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়।

শিল্প, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা — আঞ্চলিক ও জাতীয় নৃত্য, সঙ্গীত, কলা ও কারুশিল্পের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি এই স্তরে খুব ভালোভাবে হতে পারে। এই সব কার্যাবলীকে মাধ্যম করে পরিবেশ শিক্ষার কাজ খুবই ফলপ্রসূ হয়। যেমন, পরিবেশ থেকে উপাদান নিয়ে চিত্রাঙ্কন, পরিবেশ সমস্যার পোস্টার তৈরি করা, প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং তুলি তৈরি করে নেওয়া, ইত্যাদি অনেক সম্ভাবনার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

এক কথায়, সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাই পরিবেশ ভিত্তিক। পরিবেশের মাধ্যমে, পরিবেশের জন্য পরিকল্পনা করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে কোন রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পাঠক্রমের কাঠামো ও নির্দেশিকা তৈরি করে আঞ্চলিক ভাবে তার কিছুটা নমনীয় পরিবর্তন করার সুযোগ থাকা দরকার। বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ারও আমূল পরিবর্তন করা দরকার। কারণ গতানুগতিক পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে কিছুটা অনুপযোগী।

9.4.2 মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্তু (Contents of Secondary Level)

পরিবেশ শিক্ষার গোড়াতে ষষ্ঠ এককেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম International Working Meeting on Environmental Education, বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে আর ব্যাপকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের উপর উপরোক্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অষ্টম এককেও এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রীয় পাঠক্রম (Corecurriculum) ভিত্তিক। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সর্বজনীন অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান ও দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক স্তরের মত এত বেশি আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ থাকা মাধ্যমিক স্তরে সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা মূলত কৈশোরকালীন শিক্ষা। সেজন্য এখানে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেলেও তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিও এখানে থেকেই তৈরি হয় তাই অনেকেই মনে করেন, অন্যাসব বিষয় বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে (Horizontal expansion) পরোক্ষভাবে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষাদান কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে না। সেজন্য দরকার পরিবেশ শিক্ষাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শেখানো। তবে অন্যান্য বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া সম্ভব।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবেশ শিক্ষার উপাদান হিসাবে যুক্ত হতে পারে। যেহেতু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে সাত বৎসর সময় পাওয়া যায় সেহেতু একে একে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্ত প্রাথমিক তথ্য ও সমস্যা এই স্তরের ছাত্রছাত্রীরা শিখতে পারে।

● পরিবেশের ভৌত উপাদান, বায়ুমণ্ডল, বায়ুর উপাদানগুলির অনুপাত ও তার তাৎপর্য। বায়ু দূষণ, তার প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার।

● জীব পরিমণ্ডল ও জীব বৈচিত্র্য। স্বাভাবিক পরিবেশ, খাদ্য বৈচিত্র্য, খাদ্য-খাদক শৃঙ্খল। খাদ্য শৃঙ্খলে বিপর্যয়, তার কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার।

● পৃথিবীর উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। উদ্ভিদের সঙ্গে ভৌত পরিবেশ, প্রাণিজগৎ ও মানুষের সম্পর্ক। অরণ্য বিলোপের কারণ ও ফলাফল। বনসৃজনের গুরুত্ব ও সমস্যা।

● সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণি জগৎ। কৃষি সম্পদ, খাদ্যোৎপাদন ও জনসংখ্যা, খাদ্য ও জীবনযাত্রার মান। কৃষি সম্পদের উপর পরিবেশ দূষণের প্রভাব এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে বায়ু ও জল দূষণ, প্রতিকার ও প্রভাব।

● জল সম্পদ, জলের উৎস, ভূস্তরের জলের উৎস, দূষণ, প্রভাব ও প্রতিকার। ভূগর্ভস্থ জল ও তার ব্যবহার জল সম্পদের সংরক্ষণ।

● খনিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা, খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার, বিকল্প ব্যবহার।

● শক্তি ও জ্বালানি, শক্তির উৎস, শক্তির অপচয়, অপ্রচলিত শক্তির নানা উৎস। শক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্ত প্রসঙ্গ।

● উষ্ণায়ন ও তার প্রভাব, প্রতিকার। গ্রিন হাউস গ্যাস ও তার প্রভাব।

● মানব সভ্যতার বিকাশ ও পরিবেশের সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্ক। বর্তমান সভ্যতার সংকট।

প্রযুক্তি, প্রযুক্তি নির্ভর জীবন, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দুষণ, বিকল্প প্রযুক্তি।

নগরায়ণ (urbanisation) জনিত সমস্যা, বর্জ্য পদার্থ, গার্হস্থ্য বর্জ্য ও কল কারখানার বর্জ্য পদার্থ জনিত সমস্যা। বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা।

পরিবেশ সচেতনতার অর্থ ও গুরুত্ব। পরিবেশ সচেতনতার বিকাশ। পরিবেশ বান্ধব জীবন যাত্রা।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিষয়গুলি কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়, নমুনা মাত্র। তাছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের নিচু থেকে উঁচু ক্লাসের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার উপস্থাপনার মান ভিন্ন রকম। বিষয়বস্তুর বিন্যাসও নানা স্তরে নানা রকম হতে পারে। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সম্বন্ধে সমস্ত রকম মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে। সেই সঙ্গে তাদের প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ এই স্তরেই তৈরি হয়ে যাবে। পরবর্তী স্তরে শুধু আরও তাত্ত্বিক জ্ঞান, আরও উন্নত পর্যায়ের তথ্য ও সক্রিয়তার মাধ্যমে পূর্বার্জিত মূল্যবোধের স্থায়ী চরিত্রায়ন ঘটবে।

9.4.3 উচ্চতর স্তরের বিষয়বস্তু (Contents at Higher Level)

এখানে উচ্চতর স্তর কথাটির অর্থ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্রমশ নির্বাচনধর্মী এবং বিশেষজ্ঞতা অভিমুখী হয়ে ওঠে সেহেতু এই স্তরে পরিবেশ বিদ্যা (Environmental Studies) একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। School of Environmental Studies অথবা Department of Environmental Sciences এই জাতীয় নাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিবেশ চর্চা স্বতন্ত্র বিভাগে পঠন পাঠন, গবেষণা, আলোচনা সভা, গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

পরিবেশ বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চতর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বহু বিষয়ের জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ ফল একত্রিত করে পরিবেশ তার সমস্যা ও প্রতিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করার কাজে বিপুল অগ্রগতি ঘটে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে। পদার্থ বিদ্যা (Physics), জীববিদ্যা (Biology), রসায়ন ও জৈব রসায়ন (Chemistry and Organic Chemistry), কৃষিবিদ্যা (Agricultural Science), প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology), চিকিৎসা বিদ্যা (Medicine), সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography), ভূগোল (Geography), ভূবিদ্যা (Geology), সমাজবিদ্যা (Sociology), মনোবিদ্যা (Pshychology) ইত্যাদি এমন কোন বিষয় নেই যা পরিবেশকে জানার ও বোঝার প্রসঙ্গে কিছু না কিছু তথ্য দিতে পারে। এই সব বিষয়গুলি একদিকে যেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশ চর্চা করে থাকে তেমনি বিশেষ বিষয় হিসাবে পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

এই দিক থকে দেখতে গেলে, উচ্চতর শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া কার্যত অসম্ভব, কারণ তা ব্যাপক, বিস্তারিত এবং উন্মুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন ধারা, অভ্যাস, রীতিনীতি, সাধারণভাবে পরিবেশ সচেতনতা এই জাতীয় বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় স্তরের পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত বৃহত্তর ও গভীর সমস্যাগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে সমাধান করা যায় না বা করা গেলেও তা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার উপর নির্ভর... বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের গুরুত্ব এখানেই। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পারে... সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করতে সক্ষম।

উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপ, অর্থাৎ কলেজ স্তরে সাধারণভাবে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিবেশ বিদ্যার চর্চা খুব কমই করা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রগুলি এক একটি বিষয় হিসাবে কলেজ স্তরে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এই সব বিষয়গুলি পরবর্তী পর্যায়ে গভীরতর পরিবেশ চর্চার ভিত্তি তৈরি করে। কারণ, গবেষণার জন্য প্রতিটি সমস্যাই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে দেখতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় আপাত সরল এক একটি সমস্যা যথেষ্ট জটিল এবং একটির সঙ্গে আর একটি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা কখনই সমাধান করা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বর্তমান পৃথিবীর একটি প্রধানতম সমস্যা। পৃথিবীতে অতিরিক্ত বেশি জ্বালানি ব্যবহৃত হওয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার সবটা বিকীরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারে না কারণ বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যে কার্বন মনোক্সাইডের বলয় তৈরি হয় সেখানে প্রতিহত হয়ে আবার তাপ পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এর ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, প্রকৃতিক বিপর্যয়, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সামুদ্রিক জল স্তর বৃদ্ধি, জীব বৈচিত্র্যের যে শৃঙ্খল তার পরিবর্তন ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় উষ্ণায়নের অনিবার্য ফল। খুব সাধারণ ও সহজ ভাষায় এই হল বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming)। এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। এর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় নিচের চিত্রে উল্লেখ করা হল।

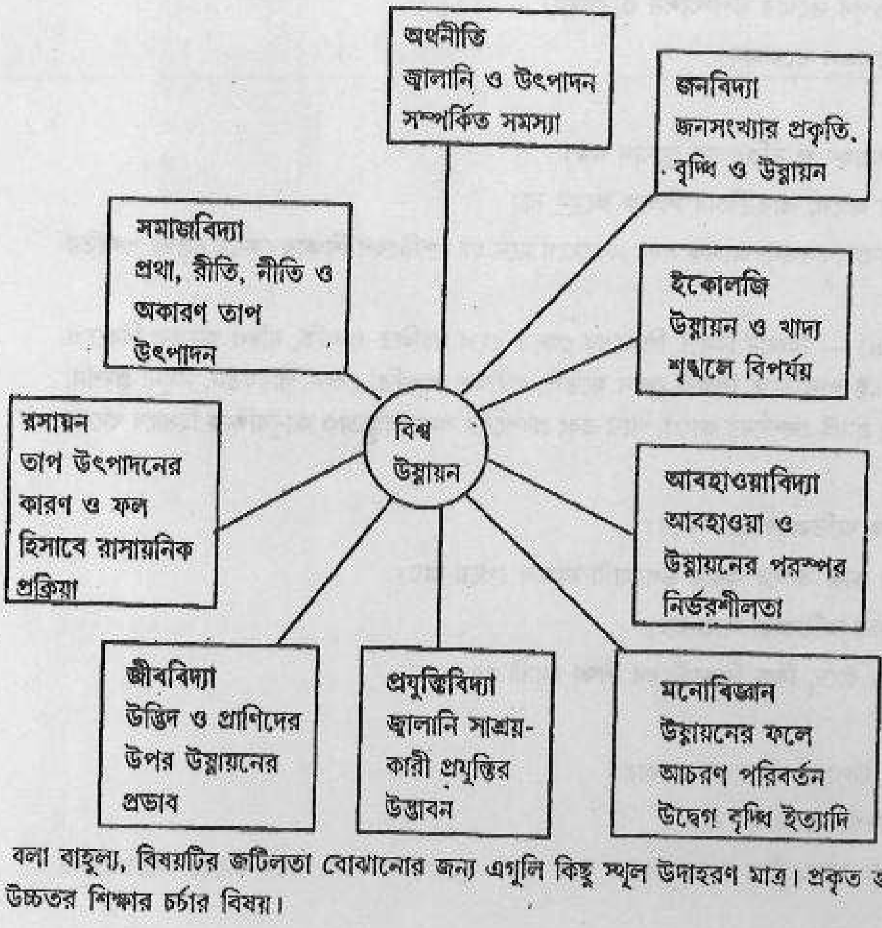

বলা বাহুল্য, বিষয়টির জটিলতা বোঝানোর জন্য এগুলি কিছু স্থূল উদাহরণ মাত্র। প্রকৃত জটিলতা আরও বেশি, যা উচ্চতর শিক্ষার চর্চার বিষয়।

9.5 পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি (Curriculum and Teaching Methods)

শুধুমাত্র পাঠক্রম কোন শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করতে পারে না। শিক্ষণ পদ্ধতি পাঠক্রমকে কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। অনেক ভালো পাঠক্রমও অনুপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য ব্যর্থ হতে পারে। সেজন্য পাঠক্রম সম্বন্ধে ধারণার পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধেও জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, পরিবেশ শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষণ পদ্ধতি নেই। নানা ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্য থেকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি বেছে নেওয়া এবং তার সঠিক প্রয়োগই প্রধান কথা। আর দুই, শিক্ষণ পদ্ধতি সর্বস্তরে এক প্রকার হতে পারে না। উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষার স্তর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা দরকার।

9.5.1 গতানুগতিক পদ্ধতি (Traditional Methods)

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত, সহজ এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষণ পদ্ধতি। এর সুবিধা,

— অল্পসময়ে বেশি তথ্য প্রদান।

— ধারাবাহিক ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা।

— সবচেয়ে কম আয়োজন প্রয়োজন।

অসুবিধার মধ্যে আছে,

— ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তার সুযোগ কম।

— ছাত্রছাত্রীরা কতটা জানে, তার বিচার শিক্ষক করেন না।

— একমুখী তথ্যের প্রবাহ, সেজন্য অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির উপযোগিতা খুবই সামান্য।

প্রদর্শন (Demonstration) — বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি, যদিও অন্যান্য বিষয়েও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কোন মডেল, পরীক্ষণ পদ্ধতি, কোন পরিবর্তন, নমুনা প্রদর্শন, এই জাতীয় কাজ করে থাকেন। প্রায়ই প্রদর্শনের আগে, পরে এবং প্রদর্শনের সময় বক্তৃতাও আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকে।

এর সুবিধা,—

— ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

— ছাত্রছাত্রীরা কোন কাজ সম্পন্ন করার উপযোগী মডেল পেয়ে যায়।

— একসঙ্গে অনেকের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

— শিক্ষকের পরিশ্রম বাঁচে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা স্থায়ী হয়।

অসুবিধা,—

— পূর্ব প্রস্তুতি এবং উপযুক্ত আয়োজন দরকার।

— অনেক ক্ষেত্রে প্রদর্শন সম্ভব হয় না।

— যদি প্রদর্শনের পর ছাত্রছাত্রীরা হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ না পায়, তবে তাদের নিষ্ক্রিয়ভাবেই শিখতে হয়।

পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা ক্লাসে প্রদর্শন সম্ভব, সেগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযুক্ত (যেমন, কার্বন ডাই অক্সাইড সংক্রান্ত কিছু কিছু পরীক্ষা)। কিন্তু পরিবেশের সমস্ত বিষয় ক্লাসে কৃত্রিমভাবে ঘটানো যায় না।

পরীক্ষণাগার পদ্ধতি (Laboratory Method) — প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়। যে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পরীক্ষণাগার আছে এবং যে সব সমস্যা পরীক্ষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব সেগুলি শিক্ষকের নির্দেশক্রমে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষণাগারে হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এর ফলে প্রদর্শন পদ্ধতির একটি দুর্বলতা দূর হয়। তবে, পরীক্ষণাগার পদ্ধতিও পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত ভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞান শিক্ষকই একমত যে এর সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়। এখানে এই পদ্ধতিকে গতানুগতিক বলা হয়েছে, কারণ যদি বাঁধা ধরা কয়েকটি পরীক্ষণ শিক্ষার্থীদের পুনরানুষ্ঠান করতে হয়, তবে এই পদ্ধতির আর বিশেষ কোন উপযোগিতা থাকে না।

9.5.2 আধুনিক পদ্ধতি (Modern Method)

আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য, এখানে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অনুসন্ধিৎসু একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী হিসাবে মনে করা হয়। শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটাই সাহায্যকারী ও নির্দেশকের। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কি শিখতে হবে, এই প্রচেষ্টার পরিবর্তে কেমন করে শিখতে হবে এই প্রচেষ্টার অভিমুখে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। সমস্ত আধুনিক পদ্ধতিগুলির একত্রিত সার সংক্ষেপ এইরকম—

- শিক্ষক বিষয়বস্তুর চুম্বক তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলেন।
- তাদের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি করে দেন।
- তিনি তথ্য ও তথ্যের উৎসগুলি তুলে ধরে তাদের আরও তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করেন।
- তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের জ্ঞানকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।
- ছাত্রছাত্রীরা বিতর্ক, আলোচনা, নানা বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এইসব প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে।
- তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে, তা সম্পূর্ণ করে দেন।

আধুনিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

- ধারণা আয়ত্তকরণ পদ্ধতি (Concept attainment method)
- প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem solving method)
- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Scientific Inquiry method), ইত্যাদি।

পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে আধুনিক পদ্ধতিগুলি খুবই উপযুক্ত। কিন্তু এই জাতীয় পদ্ধতিগুলি কার্যকর করার জন্য শিক্ষকদের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাছাড়া, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সামাজিক পটভূমি সবই গতানুগতিক পদ্ধতির অনুকূল। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষার জন্য আধুনিক পদ্ধতির স্বতন্ত্র প্রয়োগ কঠিন কাজ।

9.5.3 অন্যান্য পদ্ধতি (Other methods)

অন্যান্য পদ্ধতিগুলির সবকয়টিকে সম্পূর্ণ পদ্ধতি বলা যায় না বা পূর্বোল্লিখিত আধুনিক পদ্ধতি থেকে ভিন্ন রকম বলা যায় না। এই সব পদ্ধতিগুলির কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া হল।

আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময় (Discussion and Interaction)— এই পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতিগুলির অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ শিক্ষকের নেতৃত্বে অথবা স্বাধীনভাবে দলগত আলোচনা, আদান প্রদান ও দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আধুনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

সূচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ—(Programmed Instruction)— শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সূচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ একটি অতি পরিচিত কথা। এই পদ্ধতিতে সমস্ত বিষয়কে অনেকগুলি ছোট ছোট ফ্রেমে ভাগ করে একটি একটি করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর দানের মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে জানা যাচ্ছে যে একটি ফ্রেম শিক্ষার্থী আয়ত্ত করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী ফ্রেম উপস্থিত করা হয় না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজস্ব গতিতে শিখতে পারে। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তথ্য আয়ত্ত করার বাস্তবিক উপযোগিতা কম। এই পদ্ধতি থেকেই Multimedia Package, Computer Aided Instruction, Individualized Instruction, প্রভৃতি পদ্ধতি ও নীতিগুলির উদ্ভব হয়েছে। এর সব কয়টির ক্ষেত্রেই একই সমস্যা। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে পরিবেশ শিক্ষার অর্থ পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য আয়ত্ত করা তবে, এই পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট সফল। কিন্তু যদি পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতার বিকাশ ও মূল্যবোধের বিকাশ তবে এই পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী।

পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি (Environmental Studies Approech)

পরিবেশ শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি, পরিবেশ চর্চা। এই পদ্ধতির সারকথা, পরিবেশের মধ্যে থেকে পরিবেশের উপাদানের সাহায্যে পরিবেশের জন্য শিক্ষা। এই পদ্ধতি পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। কোন কৃত্রিম পরীক্ষণ নয়, কোন কৃত্রিম পাঠ পরিকল্পনা নয়, শিক্ষার্থীরা সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গেপরিচিত হয়ে পরিবেশের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানবে, তাকে অনুভব করবে এবং সক্রিয়ভাবে সমস্যাগুলি সমাধান করতে চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতির কার্যক্রম সম্বন্ধে নিচে একটি ধারণা দেওয়া হল পরিস্থিতি ভেদে এবং শিক্ষার স্তর ভেদে এই পদ্ধতি প্রয়োগের পরিকল্পনা এক এক ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

— চারপাশের ভূপ্রকৃতি, কৃষি, উদ্ভিদ, প্রাণী, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ধাপে ধাপে পরিচিতি লাভ করা।

— ঋতু বৈচিত্র্য, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি, নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা।

— চার পাশের জীবন যাত্রা প্রণালী, তার সমস্যা, ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

— ধীরে ধীরে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সম্পর্ক অনুধাবন করার চেষ্টা করা। যেমন, উৎসব অনুষ্ঠানের বর্জ্য (ফুল, পাতা ইত্যাদি) স্থানীয় জলাশয়ে ফেলার রীতি জলাশয়ের কি ক্ষতি করে এই বিষয়ে অনুসন্ধান।

— সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা।

— অপচয় রোধ, বিকল্প ব্যবহার, বিকল্প শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

— স্থানীয় পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুধাবন, ইত্যাদি।

এই জাতীয় কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে শিক্ষককে এবং সেই সঙ্গে ডায়েরি তৈরি করা, প্রদর্শনী, বিতর্ক সভার

আয়োজন, বা অনুরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে সংহত করা দরকার। এই বিষয়টিকেই বলা হয়েছে পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।

9.6 পরিবেশ সচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক শিখন (Environmental Awareness and Participatory Learning)

পরিবেশ সচেতনতা কাকে বলে তা নিয়ে দ্বিমত আছে। আক্ষরিক অর্থে পরিবেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সুপ্তচেতনার নাম পরিবেশ সচেতনতা। কিন্তু এই সুপ্ত চেতনা সমস্ত প্রাণিরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এর ফলে আমাদের নিজস্ব আচরণের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না বা পরিবেশের ভালো মন্দ নিয়ে বিশেষ কোন সক্রিয় চিন্তাও দেখা যায়না। এই কারণে আরও একটু নির্দিষ্ট ভাবে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

যদি বলা হয় যে সমস্ত মানুষের পরিবেশ সচেতনতা সমান নয়, অর্থাৎ পরিবেশ সচেতনতাকে একটি স্কেল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তবে তার দুই চরম প্রান্ত বিন্দুতে দুই বিপরীত ধর্মী মানুষকে পাওয়া যাবে। একদিকের মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, আর অন্যপ্রান্তের মানুষ এতটাই পরিবেশ সচেতন যে তাদের জীবন যাত্রা, চিন্তাভাবনা সবকিছুই আবর্তিত হয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এই দুই চূড়ান্তধর্মী মানুষের সংখ্যা খুব কম হলেও, অধিকাংশ মানুষ এই দুই মেরুর মাঝে কোনও না কোন বিন্দুতে অবস্থান করে। প্রশ্ন হল পরিবেশ সচেতন মানুষদের সঙ্গে কম পরিবেশ সচেতন মানুষের পার্থক্য কোথায়?

মনোবিজ্ঞানে বলা হয় মানুষের সমস্ত আচরণের পিছনে তিন ধরনের উপাদান কাজ করে—প্রজ্ঞামূলক (Cognitive), অনুভব মূলক (Affective) ও মনোসঞ্চালনমূলক (Psychomotor)। পরিবেশ সচেতনতাও একই ভাবে তিনটি উপাদান যুক্ত একটি মানসিক অবস্থা।

প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) — পরিবেশ সচেতন মানুষ তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে অনেক বেশি জানে, বোঝে, বিশ্লেষণ করতে পারে বা প্রতিটি ঘটনার বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যদিকে যারা পরিবেশ সম্বন্ধে কম সচেতন, তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে জানার বা বোঝার কোন ক্ষমতা বা প্রচেষ্টা থাকে না। তাদের প্রজ্ঞার জগতে পরিবেশ একটি নিষ্ক্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র।

অনুভবমূলক (Affective) — পরিবেশকে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে, পরিবেশ সচেতন মানুষ পরিবেশের প্রতিটি সংকেতের উত্তরে প্রতিক্রিয়া করতে চেষ্টা করেন এবং তার মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেন। প্রতি ক্ষেত্রে এই আনন্দের অভিজ্ঞতা তাদের কাছে পরিবেশকে মূল্যবান করে তোলে, পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁদের একটা সামগ্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে যা শেষ পর্যন্ত মানুষের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

মনোসঞ্চালন মূলক (Psychomotor) — শুধুমাত্র পরিবেশকে ভালোবাসা বা পরিবেশের প্রতিটি ঘটনায় সাড়া দেওয়া নয়, পরিবেশ বান্ধব আচরণের দক্ষতা অর্জনও পরিবেশ সচেতন মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিষ্ক্রিয় আনন্দ লাভ নয়, পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যে ধরনের আচরণ করা দরকার সচেতন ব্যক্তি সেই ধরনের আচরণ নিজে করে এবং অন্যদেরও করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং উপরোক্ত অর্থে পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা তবে বলা যায় যে পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ব্যক্তি,

- পরিবেশকে জানতে সচেষ্ট হবে এবং পরিবেশ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও বোধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

- পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।
- পরিবেশের ঘটনাবলীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- পরিবেশ বিষয়ক নানা তথ্য একত্রিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
- পরিবেশের নানা ঘটনার মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ধীরে ধীরে পরিবেশ সম্বন্ধে স্থায়ী আগ্রহ, ইতিবাচক প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ গড়ে তুলবে।
- পরিবেশ প্রসঙ্গে তার প্রেষণা সদা সক্রিয় থাকবে।
- পরিবেশ সহায়ক আচরণ ও দক্ষতা আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি ও আচরণ উদ্ভাবনে সর্বদা সচেষ্ট হবে।

কিন্তু উপরোক্ত অর্থে পরিবেশ সচেতনতা শুধুমাত্র ক্লাসের পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে বিকাশলাভ করবে না। তার জন্য দরকার অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।

বিভিন্ন গবেষকরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সচেতনতা কোন কাজে লাগে না। অর্থাৎ এই জাতীয় সচেতনতা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ বান্ধব আচরণে পর্যবসিত হয় না। শুধুমাত্র একধরনের সুপ্ত উচিত—অনুচিত বোধ হিসাবে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

মানুষ যখন পরিবেশ সম্পর্কিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, তখন কিন্তু আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। অংশগ্রহণের ফলে তার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় তা ধীরে ধীরে মানুষকে আরও সক্রিয় করে তোলে। সেজন্য বনসৃজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করলেও একজন মানুষ খুব কমই বনসৃজনে যত্নবান হয়। কিন্ত যদি নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে এবং নিজে বৃক্ষরোপণ করে চারা গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে তবে একটি গাছের প্রতি তার যে মমত্ববোধ জন্মায়, তা চিরস্থায়ী হয়ে অনুরূপ কাজে ক্রমাগত নিয়োজিত করে রাখে।

অংশগ্রহণের প্রকৃতি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন,

পরিবেশ সহায়ক আচরণে অভ্যস্ত হওয়া— নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে জ্বালানি সাশ্রয়, জল অপচয় না করা, সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, প্লাস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার না করা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, শব্দ সৃষ্টিকারী কোন কাজ না কারা, জৈব সারযুক্ত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস, ইত্যাদি।

অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা— নিজে পরিবেশবান্ধব আচরণ করার পাশাপাশি পরিচিত অন্যান্যদেরও অনুরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

পরিবেশ উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহন করা—বৃক্ষরোপণ ও পালন, জলাশয় সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করা, যানবাহন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ মেনে চলা, প্রাণি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

পরিবেশ বিনষ্টকারী কাজ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ—বন ধংস করার বিরোধিতা (যেমন, চীপকো আন্দোলন), জলাশয় ভরাট করার বিরোধিতা, অকারণ প্রাণি হত্যা ও নির্যাতন প্রতিরোধ, উদ্ভিদ, ফুল, ফল নষ্ট করার প্রতিরোধ, খাদ্য অপচয় প্রতিরোধ, অকারণ শক্তি ও সম্পদ অপচয়ের প্রতিরোধ ইত্যাদি।

পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহন—সভা, সমিতি, আলোচনাচক্র ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, প্রচার, পদযাত্রা, প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করা পুস্তক, পোস্টার, নাটিকা, গল্প, ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা।

আর্থিক অংশগ্রহণ—সাধ্যমত পরিবেশ বিষয়ক তহবিলে অর্থদান, অর্থ সংগ্রহ ও তার সদ্ব্যয় ইত্যাদি।

নেতৃত্বদান — শুধুমাত্র অনুগামী হিসাবে নয়, উপরোক্ত কাজগুলির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ও নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যদের পরিচালিত করা।

গবেষণামূলক— পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, লৌকিক আচার আচরণের পরিবেশ বান্ধব ও বিরোধী বিষয়গুলি চিহ্নিত করার জন্য অনুসন্ধান, কোন স্থানীয় ঘটনার পরিবেশ সম্পর্কিত কারণ অনুসন্ধান (যেমন, অত্যধিক পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের দরুন শীতকালে সমস্ত পুকুর, জলাশয় শুকিয়ে যায়) ইত্যাদি।

প্রযুক্তমূলক—তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তি যার যে বিষয়ে দখল আছে সেটিকেই পরিবেশের অনুকূলে কাজে লাগানোর চেষ্টা, বিকল্প তৈরির চেষ্টা (যেমন, বায়ো ডিজেল এখন স্বীকৃত বিকল্প জ্বালানি) এই সব।

এই সব কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মানুষ সত্যিকারের পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠে। তবে সব মানুষই যে সমস্ত প্রকার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নয়; তার প্রয়োজনও নেই। এক বা দুই ধরনের কাজে অংশগ্রহণও যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

9.7 সারসংক্ষেপ (Summary)

পাঠক্রম রচনার জন্য কোনও না কোন নীতি অনুসরণ করা দরকার। না হলে পাঠক্রম দিশাহীন হয়ে পড়ে। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার জন্যও বিশেষ কিছু নীতি আছে। সমন্বয়ের নীতি পাঠক্রম কথার অর্থ স্বাভাবিক ভাবে যে সব পাঠ্যসুচি পাঠক্রমে আছে তার মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক উপাদানগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গঠন পদ্ধতি। আর পাঠক্রম সম্প্রসারণ নীতিতে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় যা পরিবেশ শিক্ষার জন্য আবশ্যিক তা যুক্ত করে পাঠক্রম রচনা করা। পরিবেশ বিদ্যাকে একটি নতুন বিষয় হিসাবে পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াও একধরনের পাঠক্রম সম্প্রসারণ পাঠক্রম সম্প্রসারণ আনুভূমিক ও উল্লম্ব এই দুই নীতি অনুযায়ী করা যেতে পারে। আনুভূমিক নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বয়স ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব পাঠ্যবিষয় কে সম্প্রসারিত করা হয়। আর উল্লম্ব নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়, সমস্ত নীতিরই কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে।

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে পৃথক কিছু নয়। সাধারণত কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর জোর দেওয়া হয় যেমন, সচেতনতা, জ্ঞান, প্রতিন্যাস, দক্ষতা ইত্যাদি। অন্যান্য নীতিগুলি মূলত সরাসরি পাঠক্রম রচনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়। পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্ন। প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরে যেহেতু বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয় সেহেতু পরিবেশ শিক্ষার নানা দিক মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিবেশ শিক্ষাও এই স্তরেই শুরু হয়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে সমন্বয় ও সম্প্রসারণ এই দুই নীতিই অনুসরণ করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা ক্রমশ বিশেষজ্ঞধর্মী ও গবেষণা ধর্মী হয়ে ওঠে। স্কুল পর্যায়ে পরিবেশের মৌলিক বিষয় গুলি সম্বন্ধে জানা হয়ে যায় সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার এক একটি শাখা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিবেশ চর্চা করে থাকে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করে।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি গতানুগতিক ও আধুনিক দুই প্রকারই হতে পারে। প্রত্যেক প্রকার পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা বা অসুবিধা আছে। তবে প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব।

9.8 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) পাঠক্রমের সমন্বয় নীতি বলতে কি বোঝায়?

(খ) পাঠক্রমের সম্প্রসারণ কাকে বলে?

(গ) আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঘ) পাঠক্রম রচনার জন্য জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যের দুটি উদাহরণ দিন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা একটি আন্তর্বিদ্যা চর্চার বিষয় হিসাবে দেখা হয় কেন?

(চ) গণিতের মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষার একটি উদাহরণ দিন।

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কি?

(জ) পরিবেশের ভৌত উপাদান কি?

(ঝ) নগরায়ণ জনিত সমস্যা কি?

(ঞ) উচ্চতর পরিবেশ শিক্ষা গবেষণাধর্মীস্তরের—কথাটির অর্থ কি?

(ট) বিশ্ব উন্নায়নের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

(ঠ) বক্তৃতা পদ্ধতির দুটি সুবিধা বলুন।

(ড) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি কখন গতানুগতিক হয়ে ওঠে?

(ঢ) পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি কি?

(ণ) পরিবেশ সচেতনতার প্রকৃত অর্থ কি?

(ত) অংশগ্রহণমূলক শিখন কাকে বলে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পাঠক্রমের সমন্বয় উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(খ) আনুভূমিক ও উল্লম্ব নীতি কি? এই দুই প্রকার নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(গ) পাঠক্রম রচনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি কি?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে মাধ্যমিক স্তরের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষার ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

(চ) পরিবেশ শিক্ষায় প্রদর্শন পদ্ধতির উপযোগিতা কি?

(ছ) পরিবেশ শিক্ষায় সুচিবদ্ধ নিবিড় শিক্ষণ কতটা কার্যকর?

(জ) পরিবেশ চর্চার পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঝ) পরিবেশ সচেতনতা কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিন।

(ঞ) অংশগ্রহণমূলক শিখন কাকে বলে? কেন একে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলা হয়?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (**Essay Questions**)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের নীতিগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করুন। উচ্চতর শিক্ষায় গবেষণার মাধ্যমে কিভাবে পরিবেশ সমস্যার জটিল রূপটি বোঝা যায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষায় পঠন পাঠনের পদ্ধতিগুলির বিবরণ দিন। কোন্ পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো এবং কেন?

(ঘ) পরিবেশ সচেতনতার ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম রচনার নীতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক 10 □ পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Training for Environmental Education)

গঠন

10.1 সূচনা

10.2 উদ্দেশ্য

10.3 শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

10.4 শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

- 10.4.1 শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান
- 10.4.2 শিক্ষক শিক্ষণে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম
- 10.4.3 চাকুরির পূর্বে এবং পরে প্রশিক্ষণ

10.5 শিক্ষণ কৌশল

- 10.5.1 শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা
- 10.5.2 সমস্যার প্রতিকার

10.6 পরিবেশ শিক্ষণের সহায়ক উপকরণ

- 10.6.1 প্রথা সম্মত সহায়ক উপকরণ
- 10.6.2 আধুনিক সহায়ক উপকরণ
- 10.6.3 পরিবেশ শিক্ষার আরও কিছু সহায়ক আয়োজন

10.7 পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প

10.8 পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা

10.9 সারসংক্ষেপ

10.10 প্রশ্নাবলি

10.1 সূচনা (Introduction)

ইতিপূর্বে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম ও সাধারণভাবে কয়েকটি শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে সাধারণ শিক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা মানুষের দৈনন্দিন আচরণে তার প্রতিফলন ঘটার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষার ফলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ সচেতন হওয়া নয় যদি প্রতিটি মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়, যদি পরিবেশ প্রেম তাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে তবেই পরিবেশ শিক্ষা প্রকৃত সার্থক হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশ

শিক্ষার সার্থকতার জন্য দরকার সুদক্ষ শিক্ষক, যার অভাব বর্তমানে যথেষ্ট প্রকট। সুদক্ষ শিক্ষক তৈরি করার জন্য দরকার ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

বর্তমান এককে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা তত্ত্বের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই হয়ত পরবর্তীকালে শিক্ষকশিক্ষণ কলেজে শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সেজন্য তাঁদের জানা দরকার প্রশিক্ষণের কিছু খুঁটিনাটি বিষয়।

10.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমাদের দেশে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশলগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ, কার্যকর করা ও গবেষণা সম্বন্ধে প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করবেন।

10.3 শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need of Teacher Training in Environmental Education)

সাধারণভাবে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্তমানে সকলেই কিছুটা অবহিত আছেন। অনেকেরই এই বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র আছে, বিশেষত যাঁরা শিক্ষক শিক্ষণ বা অনুরূপ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। সেজন্য শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি কি সেগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার। সেই সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার জন্য দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে জানা দরকার।

একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও একজন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সঙ্গীত বিষয়ে কোনরকম প্রশিক্ষণ না নিয়েও অনেকে ভালো গান গাইতে পারেন এবং লোকের প্রশংসাও পেয়ে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন মানুষই বলবেন না যে সঙ্গীতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান প্রযোজ্য।

• শিক্ষক হওয়ার চারিত্রিক, বৌদ্ধিক ও বিদ্যাবত্তার মূল উপাদানগুলি সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছে। প্রশিক্ষণ সেই উপাদানগুলির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং সেগুলিকে পরিশীলিত করে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। যেমন, সমস্ত মানুষই অন্য মানুষকে কিছু একটা জানানোর জন্য বক্তৃতা দিতে পারে, বর্ণনা করতে পারে বা করে দেখাতে পারে। কিন্তু একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক জানেন তিনি কোন উদ্দেশ্যে কোন কথাটি বলছেন বা কোন কাজটি করছেন এবং শ্রোতা বা দর্শকদের মধ্যে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে।

• প্রশিক্ষিত শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। তিনি সেই অনুযায়ী তাঁর

নিজস্ব আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তিনি জানেন কখন তার ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগী বা অমনোযোগী, তাদের আগ্রহ ও প্রেষণা কতখানি আছে অথবা তার পরিবেশিত তথ্য ছাত্রছাত্রীরা কতটা মনে রাখতে পারছে। এই সচেতনতার জন্য তাঁর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক নানা ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। সেজন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য বজায় রাখা, তার পক্ষে সহজ কাজ। তা ছাড়াও তিনি জানেন কোন পদ্ধতি কতটা কার্যকর। সেজন্য তিনি পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী তাঁর পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন।

● প্রশিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক একজন আত্ম জিজ্ঞাসু, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি ক্রমাগত তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, শ্রেণি কক্ষের আচরণ ও শিক্ষণ সম্পর্কিত আচরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। ভুল হলে দ্রুত সংশোধন করেন এবং কখনই নিজেকে চির অভ্রান্ত মনে করেন না।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন। তিনি জানেন কোন্ পাঠাংশটি কি উদ্দেশ্যে তিনি পড়াচ্ছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্ভাব্য শিখনজনিত পরিবর্তনগুলি কি কি। এই জন্য তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি খুবই সুনির্দিষ্ট আচরণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। তিনি অল্পায়াসে অনেক বেশি শেখাতে পারেন।

● একজন দক্ষ শিক্ষক মূল্যায়নের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি জানেন এবং প্রয়োগ করতে পারেন। সেজন্য একজন অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের তুলনায় একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মূল্যায়ন সম্পর্কিত দক্ষতা অনেক বেশি। আর একথা সুবিদিত যে সঠিক মূল্যায়নের উপরই শিক্ষার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা দাঁড়িয়ে আছে।

● প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের আচরণ জনিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত। সেজন্য তাঁর পক্ষে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। আচরণজনিত সমস্যা দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে আবার সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য এই বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু উপরোক্ত প্রয়োজন ছাড়াও পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা সংযোজন করা দরকার। মনে রাখা দরকার উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) বিষয়ের শিক্ষকরাই একাধারে পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক, গবেষক ও প্রকল্পের (Project) রূপকার হিসাবে কাজ করেন। তাঁরা অনেকেই স্বপ্রশিক্ষিত বা উচ্চতর শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত (যেমন, UGC আয়োজিত নানা স্বল্পমেয়াদি কর্মক্রম, পরিবেশ মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় আলোচনা সভা, কর্মশালা ইত্যাদি)। ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রশ্নটি প্রাথমিক শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রসঙ্গেই সর্বাধিক আলোচিত হয়।

প্রথমত, পরিবেশ শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, যিনি অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষক (যেমন, জীববিদ্যা,ভূগোল বা ভৌতবিজ্ঞান) হিসাবে কর্মরত, তিনি নিজে যদি পরিবেশ সচেতন না হন তবে তাঁর পক্ষে সার্থকভাবে পরিবেশ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের সময় আর পাঁচটা বিষয়ের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করলে প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হতে পারে।

পরিবেশ শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি পরিবেশ নির্ভর। সুতরাং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষক হয়ে ওঠেন না একজন পরিবেশবিদ গবেষক অনুসন্ধিৎসু উদ্যমী মানুষও তৈরি হন। এই জন্যই পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার আর একটি দিক হল পাঠক্রম সমন্বয়ের উপযোগিতা। বিদ্যালয় স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক এক একটি বিষয়ের পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঐসব বিষয় ছাত্রছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে পড়তে অভ্যস্ত। ফলে নানা বিষয়ের মধ্যেকার যে যোগসূত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক তা তাদের কাছে অপরিচিত থেকে

যায়। পরিবেশ শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা অনেকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়ের মিলন ক্ষেত্র। সাধারণভাবে একজন শিক্ষক জ্ঞানের এই সংহত রূপটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও একজন পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর। সেজন্য পরিবেশ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে এমন ধরনের পরিবর্তন ঘটে যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ক্রমশ একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পরিগণিত হন।

এই সমস্ত কারণে পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ এত গুরুত্বপূর্ণ।

10.4 শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Teacher's Training)

এখানে শিক্ষক শিক্ষণ কথাটিকে পরিবেশ শিক্ষার প্রশিক্ষক শিক্ষণ হিসাবে ধরতে হব। আমাদের দেশে শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রম হিসাবে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই পরিবেশ শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকেই পরিবেশ মনোবিজ্ঞান (Environmental Pshychology) —মনোবিজ্ঞান গবেষণা ও পরে পঠন-পাঠনের বিষয় হিসাবে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের বিশেষ চর্চার বিষয় (Subject of Special Study) হিসাবে ঐচ্ছিক পাঠ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পরিবেশ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থও সেই সময় থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

যাইহোক ১৯৯০ সালের পর থেকে পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গটি ক্রমশ শিক্ষা বিজ্ঞানে গুরুত্ব পেতে থাকে। বিদ্যালয় স্তরে বাধ্যতামূলক ভাবে পরিবেশ শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার প্রস্তাব হলেও তা কার্যকর করতে অধিকাংশ দেশেই অনেকটা সময় চলে গেছে। এই কারণেই আনুষঙ্গিক ভাবে তখন থেকেই পরিবেশ শিক্ষাকে শিক্ষক শিক্ষণ-পাঠক্রমে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হতে আরও অনেকটা দেরি হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে, বিশেষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ স্তরে (বি.এড.), পরিবেশ শিক্ষাকে যুক্ত করার প্রাথমিক বিশেষজ্ঞ সুলভ পরামর্শ, পাঠ্য বিষয়ের রূপরেখা স্থির করা, এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (N.C.E.R.T.) বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বি. এড. পাঠক্রম যেহেতু উচ্চতর শিক্ষার আওতায় পড়ে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) নির্দেশিকা এবং আদর্শ পাঠক্রম (Model Syllabus) এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কিছুটা দিক নির্দেশ করতে সাহায্য করেছিল।

বর্তমানে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই বিষয়টি সকলের জন্য অবশ্য পাঠ্য। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমগুলি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। সমস্ত রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ অথবা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (S.C.E.R.T.) অথবা রাজ্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রকের পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ (West Bengal Board of Primary Education) বিষয়টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা (N.C.T.E.) শিক্ষক শিক্ষণের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের সময়কাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করা হয়েছে। এবং সমস্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

10.4.1 শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান (Institutes of Teacher Education)

শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থার প্রাথমিক আলোচনায় বলা হয়েছে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক এই দুই প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার কথা। পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে এই দুই প্রকার শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে সমস্ত রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Primary Teachers' Training Institute) — প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (P.T.T.I) প্রত্যেক রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। NCTE'র অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষণ দেওয়া আইন সম্মত নয়, তাদের শংসাপত্রও গ্রহণযোগ্য নয়। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো NCTE অনুমোদিত হলেও সবসময় তা পরিবেশ শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। এর কারণ, NCTE পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করলেও এর জন্য স্বতন্ত্র কোন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেনি। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ও অন্যান্য সংস্থান অনুযায়ী শুধুমাত্র পরিবেশ শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন, তাঁদের যোগ্যতার মান, কোন একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং বি.এড. ডিগ্রি। যদি তাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে অথবা বি.এড. পড়ার সময় পরিবেশ সংক্রান্ত কোন পাঠ না নিয়ে থাকেন তবে তাঁদের পক্ষে সার্থক পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষক তৈরি করা কষ্টকর।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বি.এড. পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার সংস্থান অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে খুব কমই প্রকৃত পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী শিক্ষক আছেন। এই সব বিচার করে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

—উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

— অনেক বিষয়ের ভিড়ে পরিবেশ শিক্ষা একটি অন্যতম বিষয় মাত্র, যা স্কুল পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে অথবা জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পৃক্ত নয়। ফলে অনেকের দৃষ্টিতেই বিষয়টি গৌণ।

— পরিবেশ শিক্ষার জন্য, বিশেষভাবে পরিবেশ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করা হয় না।

— গ্রামের ও শহরের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ, গ্রামের পরিবেশ ও শহরের পরিবেশ ভিন্ন তাদের সমস্যার প্রকৃতিও ভিন্ন সেজন্য অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে সে সম্বন্ধে বহু শিক্ষকেরই কোন ধারণা নেই।

— পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়ন গতানুগতিকভাবে আর পাঁচটা পরীক্ষা নির্ভর বিষয়ের মত একই। এর ফলে পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কিছু থাকে না। যান্ত্রিকভাবে রিপোর্ট তৈরি করা, ডায়েরি লেখা বা নমুনা সংগ্রহ বা অনুরূপ কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অনেক সময়ই পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে ওঠে না। লিখিত পরীক্ষার ধরন মুখস্থ করায় উৎসাহ দেয়।

মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Secondary Teacher's Training Institutes)—মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে কোন স্বীকৃত (UGC অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এড. পাঠক্রম অনুসরণ করে পঠন পাঠন হয় এবং শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রছাত্রীরা বি.এড. ডিগ্রি লাভ করে। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেশের সমস্ত বি.এড. পাঠক্রম এক বৎসর সময় সীমার মধ্যে শেষ হয়। এই এক বৎসরের মধ্যে, তিন অথবা চারটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়, দুটি মাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্তর্গত বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, একটি বিশেষ পাঠ্য বিষয় এবং শিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষা শেষ করতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে পরিবেশ শিক্ষা বি.এড. পাঠক্রমে বিশেষ পাঠ্য বিষয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রতি বৎসর যত ছাত্রছাত্রী বি.এড. পড়ে তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিবেশ শিক্ষার পাঠ নিয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়নি। সুতরাং এখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানই প্রধান। এই সব প্রতিষ্ঠানেও পরিবেশ শিক্ষাদানের উপযোগী

শিক্ষকের অভাব আছে। মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের কলেজগুলিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও অনেক দুর্বলতা আছে। যেমন,

— পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী পরিকাঠামোর অভাব।

— সময়ের স্বল্পতার দরুন বিষয় বস্তুর প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করার সুযোগের অভাব।

— তাত্ত্বিক আলোচনার প্রাধান্য।

— ব্যবহারিক বা প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের সুযোগ কম।

— উৎসাহী এবং সুদক্ষ শিক্ষকের অভাব।

— পরীক্ষা নির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুযোগ না থাকা।

— যথেষ্ট ভালো বই ও অন্যান্য উপকরণের অভাব।

উপরোক্ত সমস্যা বা দুর্বলতাগুলি ছাড়াও আর একটি প্রধান সমস্যা, আমাদের দেশে একই পাঠক্রমের মাধ্যমে যাঁরা নবাগত অর্থাৎ যাঁরা ভবিষ্যতে শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন, এবং যারা ইতিমধ্যেই শিক্ষক হিসেবে কর্মরত—এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা লাভ করতে হয়। এর ফলে, দুই দলের মধ্যে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই ধরনের চিন্তা কাজ করে। যেমন, নবাগতরা যতটা খোলা মনে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টিকে গ্রহণ করেন, চাকুরিরত শিক্ষকরা যদি এমন বিষয় স্কুলে পড়ান যা পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তবে তাঁরা পরিবেশ শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব নাও দিতে পারেন।

10.4.2 শিক্ষক শিক্ষণে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম (Environemtnal Education Curriculum in Teacher Traning)

পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম কেমন হবে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এই বিষয়ে এখনও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে বলে মনে করা হয়। যেহেতু পরিবেশ শিক্ষা নামক স্বতন্ত্র একটি বিষয় বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সেহেতু শিক্ষক শিক্ষণের যে অংশটিতে বিষয়বস্তু ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে (Content cum methods of teaching), পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম সেই অংশে রাখা হয়নি। আবার উপরোক্ত অংশের আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে শিক্ষণ পদ্ধতি (methods of teaching), পাঠ পরিকল্পনা (lesson planning) ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বর্জন করাও হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এই মডিউলের পাঠ্যসূচিতেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে পরিবেশ বিদ্যা, পরিবেশ শিক্ষার এবং পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এই তিনটি অভিমুখের মিশ্ররূপটিই বর্তমানে পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমে লক্ষ করা যায়।

পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমগুলি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যে কাঠামোটি ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ;

পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য (Information about Environment)

পাঠক্রমের এই অংশটিতে পরিবেশ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা, পরিবেশের উপাদান, উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় তথ্য, ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেওয়া হয়। এই অংশের পরিচ্ছেদগুলির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান (Knowledge) লাভ করায় সাহায্য করা।

পরিবেশ শিক্ষার পরিচয় (Introduction to Environemental Education)—এই অংশে পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা, গুরুত্ব, বিষয়বস্তু, পরিধি, নীতি পাঠক্রম এবং কখনও কখনও পরিবেশ শিক্ষার উদ্ভব ও ইতিহাস বিষয়ক

জ্ঞান লাভ করা উপযোগী তথ্যের সন্নিবেশ করা হয়। পরিবেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য জানার পর পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গেও পরিচিতি ঘটে শিক্ষার্থীদের।

পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি (Methods of Teaching Environmental Education)—এই অংশটির উদ্দেশ্য পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতিগুলি, অথবা স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, পরিবেশ শিক্ষার সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হয়।

পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপকরণ (Aids of Environemtaal Education)—যে সমস্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ পরিবেশ শিক্ষাকে সহজ ও সুগম করতে পারে তার সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া এই অংশটির উদ্দেশ্য।

বিস্তারিত পাঠ্যসূচি যাই হোক না কেন, পাঠক্রমের মূল কাঠামোটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একরকমই। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাঠক্রমে যতটা তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই তুলনায় ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বিশেষ কিছু নেই। তারফলে পাঠক্রমটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও সজীব হয়ে ওঠে না। বহু ছাত্রছাত্রীই, বিশেষভাবে যাঁরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেননি, তাঁরা পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টিকে নিছক আর একটি বিজ্ঞানের বিষয় মনে করে এড়িয়ে যান। এক কথায় শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রমগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার মত উপাদানের কিছুটা অভাব আছে।

10.4.3 চাকুরির পূর্বে ও পরে প্রশিক্ষণ (Pre-service and In-service Training)

ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরে চাকুরিরত এবং নবাগত এই দুই প্রকার শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মানুযায়ী একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরাই নিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য শর্ত পূরণের সূত্রে অনকে প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকও নিযুক্ত হয়ে থাকেন এরা পরে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এছাড়াও বহুপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা বহু আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নন। পরিবেশ শিক্ষা এরকমই একটি বিষয়।

চাকুরিরত প্রশিক্ষণহীন ও পুরনো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য, স্বল্পমেয়াদি, কেন্দ্রীভূত এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যতটা কার্যকর, গতানুগতিক, দীর্ঘ মেয়াদি এবং অনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ততটাই নিষ্ফল। এই কথার তাৎপর্য এই যে, চাকুরিরতদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে, শুধুমাত্র পরিবেশ শিক্ষার জন্য স্বল্পমেয়াদি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তাঁরা পরিবেশ শিক্ষণে যতটা দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, বর্তমান ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। নবাগত শিক্ষার্থীরা বর্তমান ব্যবস্থায় যতটা পরিবেশ শিক্ষার দক্ষতা অর্জন করেন, বি.এড. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বহু পরে তাঁদের কেউ কেউ যখন শিক্ষক হিসাবে কোন বিদ্যালয়ে যোগ দেন, তখন তত্ত্ব ও পরীক্ষা নির্ভর পরিবেশ শিক্ষা কোন কাজেই লাগে না।

এক কথায় পরিবেশ শিক্ষার জন্য বর্তমানে যে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে তা যথেষ্ট বাস্তব ও কার্যকর নয়। তার জন্য দরকার এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় শিক্ষণ ব্যবস্থা। এই কাজে শুধুমাত্র শিক্ষা বিভাগ নয়, পরিবেশ মন্ত্রক, স্বাস্থ্যমন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক সব কয়টিরই একযোগে কাজ করা উচিত।

10.5 শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

পূর্ববর্তী একটি এককে পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন সেই সব গ্রন্থকারদের অধিকাংশেই প্রচলিত যত প্রকার শিক্ষণ পদ্ধতি আছে তার বিবরণ, সুবিধা ও অসুবিধার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা আসেন তাঁদের বর্তমান বা সম্ভাব্য

বৃত্তি শিক্ষকতা। তাঁরা বিদ্যালয়ে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন সেখানেই তাঁদের শিক্ষণ প্রাপ্তির সার্থকতা। সুতরাং সাধারণভাবে পরিবেশ শিক্ষার পদ্ধতি আর শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আগত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের কৌশল সম্পূর্ণ এক রকম নয়।

অন্যান্য গতানুগতিক পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি যে কৌশলগুলি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ফলপ্রসূ হতে পারে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল,

প্রকল্প (Project) — প্রকল্প—পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষার একটি সর্বজন স্বীকৃত কৌশল, যা বহু শিক্ষাতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদের কাছে একটি উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতি। এই কৌশলের মূলকথা প্রত্যক্ষভাবে, সক্রিয়তার মাধ্যমে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা লাভ করা। প্রকল্প একক বা ব্যক্তিগত এবং দলগত দুই প্রকারই হতে পারে। তবে একক প্রকল্প অপেক্ষা দলগত প্রকল্প অনেক বেশি কার্যকর এবং সমস্তভাবেই সুবিধা জনক। পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প গঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে। আপাতত এখানে এই কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হল।

— শিক্ষার ক্ষেত্র শ্রেণিকক্ষ নয়, বাইরের পরিবেশ।

— তথ্যের উৎস পুস্তক বা শিক্ষক নয়, নিজের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ইত্যাদি।

— আগে তত্ত্ব, পরে উদাহরণ বা তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, আগে তথ্য সংগ্রহ পরে তা থেকে তত্ত্বগঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

— প্রকল্প মনোগ্রাহী সক্রিয় শিক্ষা দান করে, নিষ্ক্রিয় ও বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে শিক্ষা নয়।

— সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করার দরুন নিজের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিযোজন ঘটে।

— শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কিভাবে পরিবেশ শিক্ষা দেবেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে।

— প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে দলগত সংহতি, নিজস্ব চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পরিবেশের প্রতি সম্পর্ক দৃঢ় হয়। পরিবেশ শিক্ষার জন্য এই পদ্ধতি বা কৌশল উৎকৃষ্ট।

সমস্যা সমাধান (Problem Solving) — পরিবেশ সংক্রান্ত কোন নির্বাচিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিবেশ শিক্ষালাভ করার পদ্ধতিও অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিও মনোবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বে—একটি স্বীকৃত কৌশল। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ধাপগুলি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে পরিবেশ শিক্ষার উপযোগী ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল—

(ক) সমস্যা চিহ্নিত করণ (To identify the problem)—পরিবেশ সম্পর্কিত কোন সমস্যাকে বেছে নেওয়া। যেমন, শহরাঞ্চলে পেয় জলের (Potable water) অপচয়।

(খ) সমস্যার সংজ্ঞাদান (Defining the problem)—সংজ্ঞাদান কথাটির অর্থ সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্ট করা। যেমন, পেয় জল কাকে বলা হবে বা অপচয় বলতে কি বোঝায়। শুধু মিউনিসিপ্যালিটি যে জল সরবরাহ করে, না অন্যান্য পেয় জলের উৎসও সমস্যার মধ্যে ধরা হবে? অপচয় বলতে শুধুমাত্র পান করা ছাড়া আর সব কিছুই বোঝানো হবে না গৃহস্থালির যে কোন কাজকেই সদ্ব্যবহার হিসাবে গণ্য করা হবে?

(গ) সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় (Determining the nature of the Problem)— সমস্যার ব্যাপকতা, সমস্যার নানা দিকগুলি এবং সমস্যার জটিলতা বিশ্লেষণ করে সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করা। যেমন, সমস্ত অঞ্চলেই জলের অপচয় হয়, না অঞ্চল বিশেষে? মাথাপিছু জল ব্যবহারের পরিমাণ, জল সরবরাহের পরিমাণ, লীকেজ (Leakage) বা অনুরূপ কারণে অপচয়, ভিন্ন উদ্দেশ্যে জলের ব্যবহার ইত্যাদি যত রকম দিক সমস্যাটির সঙ্গে যুক্ত সেগুলি বিশ্লেষণ করা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন।

(ঘ) সমস্যার সম্ভাব্য কারণ (Probable cause of the problem) উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করা।

(ঙ) সমাধানের উপায় নির্ধারণ (To find solution of the problem)— যতরকম সমাধান সম্ভব সেগুলি নির্ধারণ করা এবং তাদের তুলনামূলক বিচার করা।

(চ) সমাধানের উদ্যোগ (Efforts towards solution)—সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

(ছ) ফলাফলের বিচার (Review of results)—পূর্বোক্ত উদাহরণের বেলায় জল অপচয় কতটা কম বা ব্যবহারকারীদের অভ্যাসে কতটা পরিবর্তন হয় তার বিচার করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় থেকে একটু ভিন্ন। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এমন নয় যে একবার সমাধান হলে কাজ শেষ হয়ে যায়। অথবা অন্যভাবে বলা যায় কখনই এই সব সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। সেজন্য এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকে। সমস্যার সংজ্ঞাদান, সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়, সমস্যার সম্ভাব্য কারণ বিচার প্রভৃতি ধাপগুলির মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক তাত্ত্বিক শিক্ষাও হতে পারে। সেজন্য এই ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবেশ শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী।

কার্যকরী গবেষণা (Action research)—পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে কার্যকরী গবেষণাও একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রায় সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অনুরূপ কারণ কার্যকরী গবেষণাও কোন একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হয়। এক্ষেত্রে গবেষণার পদ্ধতিগত নীতিগুলি কঠোর ভাবে অনুসরণ করার দরুন আরও সুনির্দিষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। তাছাড়াও পরীক্ষামূলক ভাবে কোন পদক্ষেপ নিয়ে তার ফলাফল বিচার করার সুযোগও এখানে থাকে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বৃহৎ এবং ব্যাপক। কার্যকরী গবেষণার জন্য ঐ সমস্যাকে অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নিয়ে গবেষণার উপযোগী সমস্যা নির্বাচন করা হয়। যেমন,

— নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে মধ্য বা উচ্চবিত্ত মানুষের জল ব্যবহারের পরিমাণের পার্থক্য ও তার কারণ নির্ণয়।

— জল সরবরাহকারী কর্মীদের সন্তুষ্টির (Job satis/faction) সঙ্গে মেরামতি কাজের গতি ও জল অপচয়ের সম্পর্ক।

— পরিবেশে সচেতনতা ও জল সম্পদ বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে জল ব্যবহার প্রবণতার সম্পর্ক, ইত্যাদি।

এইসব উদাহরণ কার্যকরী গবেষণার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য নমুনা মাত্র। প্রকৃত সমস্যা আরও সুনির্দিষ্ট যুক্তিনির্ভরভাবে নির্বাচন করা হয় এবং তা সংখ্যায় অনেক হতে পারে। অনেকগুলি গবেষণালব্ধ ফল একত্রিত করে সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষার সমস্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে।

10.5.1 শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা (Problems related to teachers' Training)

শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ শিক্ষার আয়োজন ও সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সমস্যা। সামগ্রিক ভাবে কিছু কিছু দুর্বলতা ও সমস্যার কথা ইতিপূর্বে শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও কিছু সমস্যা এখানে তুলে ধরা হল।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব—আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে বাদ দিলে পরিবেশ ও পরিবেশ শিক্ষার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই কারণে যাঁরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তারা যতটা পাঠক্রম ও পরীক্ষার দাবি সম্বন্ধে তৎপর, পরিবেশ সচেতনতার ভিত্তিতে নিজস্ব তাগিদে পরিবেশ শিক্ষার পঠন পাঠনে ততটা তৎপর নন। সেজন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠায় প্রবল বাধা সৃষ্টি হয়, পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সার্থক হয় না।

শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা— শুধুমাত্র প্রেষণার অভাব নয়, পরিবেশ শিক্ষণের সঠিক পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমাজ সেবামূলক (Social Service or Community Service) জাতীয় কিছু কিছু গৌণ বিষয় রাখা হয় যা খুব গুরুত্ব সহকারে না দেখায় নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হয়। এই বিষয়ে যে সব কার্যক্রম নেওয়া হয়, তাতে পরিবেশ শিক্ষার উপাদান বিশেষ কিছু থাকে না।

শিক্ষক শিক্ষণকে জাতীয় স্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে কোন জাতীয় কর্মসূচি নেই। কোন জাতীয় নীতি অথবা কর্মসূচি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে রাজ্যস্তরে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কোন অর্থবহ কার্যক্রম হাতে নেওয়া কঠিন, এরকম কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া হলেও তার ফলাফল যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে না।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে দেশের খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট কম, ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও কম।

দেশের পরিবেশ নীতির সঙ্গে পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার কোন সামঞ্জস্য নেই। অর্থাৎ পরিবেশ দপ্তর ও মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই।

অন্যান্য পরিকাঠামো, উপযুক্ত শিক্ষক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

10.5.2 সমস্যার প্রতিকার (Remedies of the Problems)

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান একান্ত অসম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

- পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে অথবা বর্তমান পরিবেশ নীতির মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টিকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে হবে।
- পরিবেশ দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দিতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎকে এই বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (S.C.E.R.T.) ও জেলা স্তরে জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (D.I.E.T.) গুলিকে নেতৃত্বদাতা সংস্থা (Nodal agency) হিসাবে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। প্রথমে রাজ্য ও জেলা স্তরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক তৈরি করে তারপর এক একটি বিদ্যালয় গুচ্ছের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাজ্য স্তরেও বিভিন্ন মন্ত্রক, শিক্ষা পর্ষৎগুলির (মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইত্যাদি) মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষার জন্য অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ করতে হবে এবং সেই মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকভাবে এর সূচনা হয়েছে।

● পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ ও তার সদ্ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে অনুরূপ গুরুত্ব ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে পরিবেশ শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ পরিবেশ শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। অনেক সময় অর্থ বরাদ্দ করা হলেও তা ব্যবহার সম্বন্ধে অস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকায় তার অপচয় হয়। সে জন্য আগে শিক্ষক তৈরি করে তারপরে অথবা একই সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রীয় স্তরেই।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়কেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কার্যকর পরিবেশ শিক্ষা সম্ভব নয়।

10.6 পরিবেশ শিক্ষণের সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids in Environmental Educations)

উপরোক্ত আলোচনায় যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের জন্যও পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো দরকার। পরিকাঠামোর প্রধানতম উপাদান হল শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের উপযুক্ত আয়োজন করা।

10.6.1 প্রথাসম্মত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Conventional Teaching Aids)

এই জাতীয় শিক্ষক সহায়ক উপাদানগুলি অধিকাংশেই অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এদের সাধারণভাবে এক কথায় দৃশ্য ও শ্রাব্য সহায়ক (Audio-visual Aids) বলা হয়। প্রধানত এই উপকরণগুলি বক্তৃতাধর্মী শিক্ষণ পদ্ধতির Lecture based teaching methods) সঙ্গে সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চার্ট ও মডেল (Charts and Models)— কোন কিছুর ছবি, তালিকা অথবা মডেলের সাহায্যে যে সব বিষয়ের বর্ণনা বিষয়টির ধারণা সম্পূর্ণ করতে পারে না সেই সব বিষয়ের ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চার্ট, মডেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ বিষয়ক চিত্র, ফটোগ্রাফ (স্থির), মডেল ইত্যাদি পরিবেশ শিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। অনেক সময় এই সব উপকরণ শিক্ষক নিজেই অথবা ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করে নিতে বা সংগ্রহ করতে পারে।

প্রোজেক্টার, স্লাইড প্রোজেক্টার, ফিল্ম স্ট্রীপ ইত্যাদি (Projector, Slide projecter, Film strip etc.)— এইগুলি বিশেষজ্ঞ নির্মিত এবং চার্ট মডেলের উন্নততর সংস্করণ। তবে চার্টও মডেল অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়। অনেক বিষয় পরপর প্রোজেক্ট করা যায় কিন্তু চার্ট বা মডেল প্রদর্শিত বিষয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। তবে এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর দেখা ও শোনা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে দীর্ঘ সময় ধরে এগুলি দেখালে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও মনোযোগ কমতে পারে, ক্লান্তি আসতে পারে।

চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, ভিডিও এবং ভিডিও সি.ডি. (Movie, Documentary, Video and Video CD)—এই সব শিক্ষা সহায়ক উপকরণ খুবই আকর্ষণীয়। সচল এবং রঙীন হওয়ার দরুন এগুলি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়কে তুলে ধরতে পারে। শিক্ষকের বক্তৃতার বিকল্প হিসাবে কোন ভাষ্যকার মনোগ্রাহী কণ্ঠে বর্ণনা দিতে পারেন, যা ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগের ঘাটতি হতে দেয় না। এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, আলাদা ভিডিও টেপ অথবা সি.ডি. তৈরি করে রাখলে সেগুলি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং বার বার ব্যবহার করা যায়।

উপরোক্ত সহায়ক উপকরণগুলিকে প্রথা সম্মত বলার কারণ এগুলি ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীরা থাকে নিষ্ক্রিয়। চলচ্চিত্র, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শন শেষ হলে শিক্ষক যদি কোন আলোচনার সূত্রপাত করেন তবে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নোট নিতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনের সময় তাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। আরও আধুনিক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি দূর করা যায়।

10.6.2 আধুনিক সহায়ক উপকরণ (Modern Aids)

মিথস্ক্রিয়া ভিত্তিক বহুমাধ্যম ব্যবস্থা (Interactive multimedia system)—চলচ্চিত্র ইত্যাদি উপকরণে যেহেতু দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই প্রকার উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় সেহেতু একদিক থেকে দেখতে গেলে এগুলিও বহুমাধ্যম ব্যবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু কম্পিউটার ভিত্তিক বহুমাধ্যম ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের কী বোর্ড ব্যবহার করে ইচ্ছামত তথ্যের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের ক্ষমতা ও সুবিধামত শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়াই শিখতে পারে। নিষ্ক্রিয়তা না থাকায় এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। কিন্তু এই ব্যবস্থা সহজ ও সর্বত্র লভ্য নয় এবং ব্যয় বহুল।

অন্তর্জাল (Internet, Website)—তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাও অনেকেই দক্ষ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন তথ্য শিক্ষার্থীরা পছন্দমত কম্পিউটারের পর্দায় দেখে নিতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টি ব্যক্তি নির্ভর এবং কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়াই সম্ভব। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

এছাড়াও টেলিভিশনে ডিসকভারি (Discovery), ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক (National Geographic), অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট (Animal Planet) প্রভৃতি চ্যানেলেও পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এদের পরিকল্পিত ব্যবহার সম্ভব নয়।

10.6.3 পরিবেশ শিক্ষার আরও কিছু সহায়ক আয়োজন (Some more Aids for Environmental Education)

এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হবে। এইগুলিকে শিক্ষণ পদ্ধতি বলা যায় না আবার শিক্ষা সহায়ক উপকরণও বলা যায়না। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হল।

প্রদর্শনীর আয়োজন (Arranging Exhibition— কোন প্রদর্শনীতে যোগদান করা বা প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পরিবেশ বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে তা পরিবেশ শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। প্রদর্শনীর আয়োজন করা কথাটির অর্থ এই নয় যে শিক্ষকের নির্দেশমত কিছু মডেল, চার্ট ইত্যাদি সাজিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। শিক্ষকের নেতৃত্বে হলেও সর্বস্তরে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে নিজেদের উদ্যোগে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে পরিবেশ শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ অথচ ফলপ্রসূ মাধ্যম পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর বিষয় নির্বাচন (Theme), পরিকল্পনা, প্রদর্শনীর দর্শনীয় বিষয়গুলি স্থির করা, সেগুলি সংগ্রহ করা এবং তৈরি করা, প্রদর্শনীর সাজ সজ্জা, প্রদর্শকদের (Demonstrater) তৈরি করা এবং সবশেষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা এই সব স্তরেই ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমেই পরিবেশ শিক্ষার সার্থকতা আসতে পারে।

এই সঙ্গে পরিবেশ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ, দেওয়াল পত্রিকা, আলোচনা চক্র ও বক্তৃতার আয়োজন করলে তা আরও বেশি ফলপ্রসূ হয়। আকস্মিকভাবে কোনও এক বছর এই জাতীয় পরিকল্পনা না নিয়ে নিয়মিত বাৎসরিক পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন হলে পরিবেশ শিক্ষার ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion)—শিক্ষামূলক ভ্রমণ খুব অপরিচিত বিষয় নয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই শিক্ষামূলক ভ্রমণ যতটা ভ্রমণের আনন্দ পাওয়ার জন্য আয়োজন করা হয় শিক্ষামূলক দিকটা ততটাই অবহেলিতও থাকে। যদিও বিশেষ বিশেষ পাঠ্য বিষয়, যেমন, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক নয়। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। বৃক্ষচ্ছেদন, অরণ্য লোপ ও ভূমিক্ষয়ের প্রসঙ্গটি উপযুক্ত স্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে যতটা সহজে বোঝা যায় আর কোনভাবেই সেটা সম্ভব নয়। এই ধরনের অসংখ্য বিষয় আছে যা শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজন করে আনন্দ ও পরিবেশ শিক্ষাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা কিছুটা সীমিত কারণ, সকলের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়না। তাছাড়াও ভ্রমণ, ক্যাম্প ইত্যাদি ব্যয় সাপেক্ষ এবং সমস্ত কিছুই ভ্রমণের মাধ্যমে শেখানো সম্ভব নয়।

10.7 পরিবেশ শিক্ষার প্রকল্প (Projects on Environmemtal Education)

প্রকল্প কথাটির দুই প্রকার অর্থ। প্রকল্প একটি শিক্ষণ পদ্ধতি এবং প্রকল্প হল ক্ষেত্র নির্ভর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক স্ব-শিখন প্রক্রিয়া। উভয় প্রকার অর্থের মধ্যে, কোন বিরোধ নেই। কারণ স্বশিখন হলেও সেটি একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত সার্থক শিক্ষণ পদ্ধতি। প্রকল্প ও গবেষণার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রকল্প তৈরি করা অথবা প্রকল্পের মাধ্যমে কোন গবেষণামূলক সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া বিরল নয়। সেজন্য এই জাতীয় পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে প্রকল্পের ধাপগুলি নিচে দেওয়া হল।

- প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন— অর্থাৎ প্রকল্পের মাধ্যমে কোন্ বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হবে তা স্থির করা।
- প্রকল্পের ক্ষেত্র নির্বাচন— অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র (Field) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, সূত্র, পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয় পাওয়া যাবে তা নির্বাচন।
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি— কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
- তথ্য সংকলন— কিভাবে প্রাপ্ত তথ্যের সংকলন করা হবে। গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণবাচক (Quantitative) তথ্য থাকলে সেগুলি কিভাবে সংকলন করা হবে।
- তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ— তথ্যগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে নেওয়া।
- সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রিপোর্ট তৈরি করা।

এখানে কয়েকটি পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হল।

১। অঞ্চল বিশেষে শব্দ দূষণের পরিমাণ ও তার প্রভাব।

২। জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাস ও বায়ুতে বিভিন্ন দূষণের মাত্রা ও তার প্রভাব।

৩। কৃষিক্ষেত্র সন্নিহিত জলাশয়ে জলে জলজ প্রাণিদের উপস্থিতি ও তার পরিবর্তন।

৪। বন সৃষ্টির প্রভাবে স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন।

৫। উন্নয়ন ও তার প্রভাবে মানুষের সহিষ্ণুতার পরিবর্তন।

বলা বাহুল্য উদাহরণগুলি কাল্পনিক নমুনা মাত্র। প্রকৃত প্রকল্প শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্বাচন করা দরকার।

10.8 পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা (Research in Environmemtal Education)

পরিবেশ বিদ্যার (Environemntal Studies) এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচেষ্টা বেশি দেখা যায়না। এর কারণ এখনও শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষকশিক্ষণ পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে নি এবং ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে নি। অথচ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা ছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারে না।

পরিবেশ শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রাধান্য বেশি।

১। বিদ্যালয়ে পাঠ্য জীবন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিকাশ।

২। ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতা পরিমাপ করার উপযোগী প্রশ্নোত্তরিকা নির্মাণ ও তার ব্যবহার।

৩। পরিবেশ শিক্ষার প্রতি শিক্ষকদের প্রতিন্যাস ও তার প্রভাব।

৪। পরিবেশ সম্পর্কিত প্রেষণার পরিমাপ।

৫। পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সক্রিয়তার (প্রশ্নোত্তরিকার মাধ্যমে) সম্পর্ক নির্ণয়।

৬। স্নাতক স্তরে ও বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষার প্রভাবে পরিবেশ সচেতনতার পরিবর্তন।

৭। পরিবেশ শিক্ষার পাঠক্রম পর্যালোচনা।

এই ধরনের আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়ে আরও ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

10.9 সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিবেশ শিক্ষার অপরিহার্যতার অনেক কারণ আছে। এই সব কারণের মূল কথা পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে মানুষের আচরণ পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশ সমস্যা দুর করায় এবং পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এর কারণ উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তাতে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই পাঠক্রমের মেয়াদ দুই বৎসর হওয়ায় কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু বি.এড. কলেজ গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় এবং স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাতত্ত্বের পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা একটি ঐচ্ছিক বিষয়। সেজন্য খুব কম ছাত্রছাত্রীই পরিবেশ শিক্ষাগ্রহণ করে। এর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব যথেষ্ট।

পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষণের জন্য সাধারণত গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে অনুপযুক্ত। প্রকৃত কার্যকর শিক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে শিক্ষণ সংক্রান্ত অনেক সমস্যা আছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা, জাতীয় স্তরে উপযুক্ত নীতির অভাব ইত্যাদি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এই সব সমস্যার প্রতিকার অসম্ভব নয়। বিভিন্ন মন্ত্রকগুলির মধ্যে সমন্বয়, সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনা, শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান, ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যার প্রতিকার সম্ভব।

শিক্ষক শিক্ষণের ও পরিবেশ শিক্ষার সহায়ক উপকরণ ও আয়োজন সার্থক শিক্ষক শিক্ষণের অন্যতম শর্ত। এইসব আয়োজনের অন্যতম প্রদর্শনীর আয়োজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি। পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা এখনও খুবই সীমাবদ্ধ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ।

10.10 প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very short answer questions)

(ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের মধ্যে একটি পার্থক্য বলুন।

(খ) পাঠক্রম সমন্বয়ের উপযোগিতা কি?

(গ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণে NCERT'র ভূমিকা কি?

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি?

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ার ফল কি?

(চ) চাকুরির পূর্বে এবং পরে একই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকায় কোন্ সমস্যা সৃষ্টি হয়?

(ছ) প্রকল্প কাকে বলে?

(জ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রথম ধাপটি কি?

(ঝ) ঐ পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ কি?

(ঞ) কার্যকরী গবেষণা কাকে বলে?

(ট) শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝায়?

(ঠ) পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষণের জন্য জাতীয় নীতি দরকার কেন?

(ড) চার্ট, মডেল প্রভৃতিকে প্রথা সম্মত সহায়ক উপকরণ বলা হয়েছে কেন?

(ঢ) চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে সক্রিয় হতে পারে?

(ণ) বর্তমান শিক্ষা গবেষণার দুটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।

(খ) শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা দিন।

(গ) চাকুরির পূর্বে ও পরে শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষণ কৌশল হিসাবে প্রকল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) সমস্যা সমাধান মূলক পদ্ধতি কি? নিজস্ব একটি উদাহরণ দিন।

(চ) শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির পরিচয় দিন।

(ছ) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ হিসাবে চলচ্চিত্র, ভিডিও ইত্যাদির উপযোগিতা কি?

(জ) আধুনিক শিক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলির পরিচয় দিন।

(ঝ) পরিবেশ শিক্ষা, প্রদর্শনীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

(ঞ) পরিবেশ শিক্ষা গবেষণার উপযোগিতা ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay questions)

(ক) পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(খ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের কৌশলগুলি কি কি? সংক্ষেপে কৌশল গুলির পরিচয় দিন ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আলোচনা করুন ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।

(ঘ) পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণের সহায়ক উপকরণগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণের জন্য প্রদর্শনী ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়টি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(চ) যে কোন একটি সমস্যা নির্বাচন করে সমস্যা সমাধানমূলক শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

(ছ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(অ) বর্তমান পরিবেশ শিক্ষার গবেষণা, (আ) কার্যকরী গবেষণা (ই) প্রকল্প, (ঈ) শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নুতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধুলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

–Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(*NSOU*-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.